বিশ্বসংগ্রামের গতি

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
নবেম্বর. ১৯৪৩

দাম দু'টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স এর পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

এই বইএর অনেকগুলো প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু তা সত্বেও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা ব'লে এগুলোর ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি। কোন কোন প্রবন্ধ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধবার অব্যবহিত পরই প্রকাশিত হয় ; তাতে যুদ্ধের বর্তমান পরিণতির ইঙ্গিত ছিল ব'লেই এই বইএ এখন তা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হ'ল। 'মস্কো-সম্মেলন', 'সমরাবর্তে ভারতবর্ষ' প্রভৃতি কয়েকটি নতুন অধ্যায়ও এতে সংযোজিত করা হয়েছে।

বর্তমান যুদ্ধ এতই জটিল যে এর মূল ধারাটি খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি সেটাই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছি ; সফল হয়েছি কিনা তার বিচারক পাঠকগণ। এ যুদ্ধে লোকের ক্ষয়ক্ষতি ও অশেষ দুর্গতি দেখে, বিশেষ ক'রে আমরা যে অবস্থায় পতিত হয়েছি তাতে স্বভাবতই মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব আসে ; কিন্তু এর মধ্যেও জগতের গণমুক্তির যে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই আমাদের ও বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে একমাত্র আশার কথা। এই বইএ আমি সেই বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকেই দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। ইতি

নিবেদক

কলিকাতা, ১৯শে নবেম্বর, ১৯৪৩

গ্রন্থকার

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস, শ্রীপতি প্রেস, ১৪, ডি, এল, রায় স্ট্রীট,
কলিকাতা

সূচীপত্র

বিশ্বসংগ্রামের গতি

সামরিক গণ্ডী

যুদ্ধের ট্যাকটিক্‌স্‌ ও স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ রণকৌশল ও সমরনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই হয়তো অনেকে মনে করবেন, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে প্রয়োজন কি? ওসব বড় বড় সেনাপতি ও যোদ্ধাদের ব্যাপার, আমাদের মতো পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে তা নিয়ে মাথা ঘামানো বাতুলতা মাত্র। এ মনোভাবটা কেবল আমাদের দেশেই প্রবল নয়, যে-সব দেশ যুদ্ধ করছে সেগুলোর মধ্যেও কোন কোন দেশে অদ্যাবধি এ মনোভাব বিদ্যমান যে, যুদ্ধের ট্যাকটিক্‌স্‌ ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অযোদ্ধাদের আলোচনা করা অনধিকারচর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৈনাপত্যের ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত এবং সামরিক ব্যাপারে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে একমাত্র তাঁরাই ট্যাকটিক্‌স্‌ ও স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে আলোচনা করা বা কথা বলবার অধিকারী। কিন্তু আধুনিক সার্বিক যুদ্ধের ব্যাপকতা ও সমগ্রতার কথা চিন্তা করলে কি এ মতকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া চলে যে সামরিক ব্যাপারে সাধারণ নাগরিকদের বলবার কিছুই নেই বা কোনো কথা বলা অশোভন? আধুনিক যুদ্ধ তো আর কেবল সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সৈনিক-অসৈনিক, ধনী-নির্ধন, কৃষক-মজুর সকলেরই যুদ্ধে আজ প্রায় সম প্রয়োজন। আধুনিক সার্বিক যুদ্ধে সৈনিকের চেয়ে অসৈনিকের প্রয়োজন মোটেই কম নয়। সার্বিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যই এই যে তা সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশ করে। সকল প্রচেষ্টার সমবায়েই সার্বিক যুদ্ধ চালানো সম্ভব।

অতএব দেশের সকলের সমবেত চেষ্টায় যে যুদ্ধ চলে সে যুদ্ধপরিচালনা সম্বন্ধে কেবল যোদ্ধারাই কথা বলবার অধিকারী, অযোদ্ধারা কিছুই বলতে পারবে না বা বললে তা অনধিকারচর্চা হবে—এ মনোভাবের পশ্চাতে কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। আধুনিক সার্বিক যুদ্ধ যেমন ব্যাপক তাতে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, যুধ্যমান কোন রাষ্ট্রের ব্যক্তিমাত্রই সৈনিক; তবে সে যোদ্ধাও হতে পারে বা অযোদ্ধাও হতে পারে। অযোদ্ধাদের স্থান যে আজকালের যুদ্ধে যোদ্ধাদের নীচে একথা বলা যায় না। কাজেই যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে অযোদ্ধাদেরও মতামত প্রকাশে নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। তবে সেই অধিকারের সীমা কোথায় তা অবশ্য বিবেচ্য বিষয়।

অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন তুললেই দেখতে হবে যে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আলোচকের যোগসূত্র কতটুকু? যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে দুটি কথা আসে—ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ ও স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ রণকৌশল ও সমরনীতি। কাজেই কোন অযোদ্ধার পক্ষে যুদ্ধপরিচালনা সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই তাঁকে বিচার করতে হবে যে ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ ও স্ট্র্যাটেজি এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিরূপ। স্ট্র্যাটেজি কি? সমরপরিচালনার ব্যাপক পরিকল্পনাকেই সাধারণত বলা হয় স্ট্র্যাটেজি। অভিযানের পরিকল্পনা যিনি করেন তাঁকেই বলে 'স্ট্র্যাটেজিস্ট'। আর কি ভাবে কোন্‌ অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে কি কৌশলে রণ করা হবে তার পরিকল্পনা যিনি করেন তাঁকে বলা হয় 'ট্যাক্‌টিসিয়ান'। শেষোক্ত ব্যক্তির কাজ হ'ল রণাঙ্গনে সৈন্যচালনা করা এবং সৈন্যরা কিভাবে রণ করবে তার নির্দেশ দেওয়া। কাজেই কোথায় কিভাবে কোন্‌ অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে—সঙ্গীন চালানো হবে কি হাতবোমা ছোঁড়া হবে—এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ট্যাক্‌টিসিয়ান যেমন মাথা ঘামান, স্ট্র্যাটেজিস্ট তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। তাঁকে মাথা ঘামাতে হয় তদপেক্ষা আরো অনেক বড় ব্যাপার নিয়ে।

সেই বড় ব্যাপারটা কি এবার সেকথাই বলা দরকার। স্ট্র্যাটেজিস্টের কেবল বিচ্ছিন্নভাবে সমরের চিন্তা করলেই চলে না; রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকটাও তাঁকে ভাবতে হয়। আধুনিক সার্বিক যুদ্ধে লড়াই ক'রে হোক, অস্ত্রনির্মাণ ক'রে হোক অথবা অর্থসাহায্য বা অন্য যে কোনো প্রকারেই হোক সমগ্র জাতিকেই একভাবে না একভাবে যুদ্ধচালনায় সাহায্য করতে হয়। এমন কথাও বলতে শোনা যায় যে, বিপদের সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে পারলে তা দিয়েও যুদ্ধে সাহায্য করা চলে। শ্রমিকদের কর্মশক্তি বৃদ্ধি ও সৈনিকদের উৎসাহদানের জন্যে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হামেশাই হয়ে থাকে। সুতরাং এমন ব্যাপক যুদ্ধের পরিকল্পনা যিনি করবেন নিশ্চয়ই তাঁর চোখের সামনে যে-দেশের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করবেন তার পূর্ণ চিত্র থাকা চাই। তার চেয়ে আরো বেশী দরকার যাদের দিয়ে তিনি অভিযান চালাবেন তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। বলা বাহুল্য, স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ দুদিকেরই সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে স্ট্র্যাটেজিস্টের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটার প্রতিও তাঁর লক্ষ্য রাখতে হয়। তারপর যে যুদ্ধের প্রভাব জগদ্ব্যাপী তার স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে স্ট্র্যাটেজিস্টের সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। কেবল দেশ ও পাত্র সম্বন্ধে ধারণা থাকলেই চলে না, কাল সম্বন্ধেও তাঁর একটা বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। কালের আবর্তন কোন্ ভবিষ্যৎকে ডেকে আনতে পারে—সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি না থাকলে তা ধরা কঠিন। এই কালের হিসেবেই যত গোলমাল হয়ে যায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ বাধবার বছরখানেক কি বছর দুএক বাদে সামরিক মহলে একটা নতুন কথার সৃষ্টি হয় 'লিমিটেড অবজেক্টিভ' বা আপাত লক্ষ্য। তার অর্থ, সমরনায়ক সৈন্যদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করতেন যে, একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে পারলে আর তাদের অগ্রসর হতে হবে না, কারণ তা করতে গেলে তাদের সাহায্যকারী অন্যান্য সৈন্য অসুবিধায়

পড়তে পারে। এভাবে আপাতলক্ষ্য হস্তগত হ'লে পর সৈন্যাধ্যক্ষ আবার পরবর্তী লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে নতুন ক'রে পরিকল্পনা করতেন এবং এভাবে যুদ্ধ বিলম্বিত হ'ত। এই 'আপাতলক্ষ্যের' ভিত্তিতে যুদ্ধচালনায় বিশেষভাবে আপত্তি উঠল এ কারণে যে, প্রতিবারই একটি লক্ষ্যে উপনীত হয়ে আবার পরবর্তী লক্ষ্যে যাবার জন্যে নতুন ক'রে পরিকল্পনা করতে হয়।

সুতরাং দেখা যায়, যথার্থই বড় সেনাপতি হতে হ'লে কেবল উপস্থিত কর্তব্যজ্ঞান থাকলেই চলে না, চরম লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। কেবল কতকগুলো স্থান বিশেষ থেকে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের তাড়িয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ নয়, সমগ্র যুদ্ধকে কিভাবে জয় করা যায় সেই কথাই তাঁর বিশেষভাবে ভাবা দরকার। শুধু তাই বা কেন, তাঁর অভিযান সফল বা ব্যর্থ হ'লে যেসব অবস্থার উদ্ভব হতে পারে সে সম্বন্ধেও পূর্বাহ্লেই তাঁর ভেবে দেখা উচিত। এমনও হওয়া কিছু অসম্ভব নয় যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা হ'ল অথচ তার ফল বিজয়ী জাতির পক্ষে অশুভ হয়ে দাঁড়াল। অতএব স্ট্র্যাটেজিস্টদের সর্বাগ্রে বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার যুদ্ধের পর কি অবস্থা আসতে পারে এবং তাঁদের কর্তব্য সেই অবস্থার জন্যে পূর্বাহ্লেই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া। আজকাল যে যুদ্ধ হয় তা জাতির বিরুদ্ধে জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সার্বিক যুদ্ধে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করতে হয়। অতএব যে-যুদ্ধের ফলাফলের ওপর এক একটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করে তা কেবল সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপার হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন অল্পবিস্তর এর সঙ্গে বিজড়িত এবং প্রত্যেকেরই ভাগ্যসূত্র যখন এর সঙ্গে গ্রথিত তখন এই ব্যাপারে ভালোমন্দ বলবার অধিকারও প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। অতএব আধুনিক সার্বিক যুদ্ধে 'ট্যাক্‌টিক্‌স্' সম্বন্ধে অসামরিক ব্যক্তিদের মতামতের মূল্য যদি নাও থেকে থাকে, স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে তাঁদের মতামতের যে মূল্য ও প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। আধুনিক সার্বিক যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নিরূপণে অন্তত গণতন্ত্রের

সমর্থক দেশগুলোতে জনমতের প্রভাব পড়তে বাধ্য; তবে দেশ বিশেষে তার তারতম্য ঘটতে পারে।

তারপর সার্বিক যুদ্ধ যেখানে জনযুদ্ধের স্তরে নেমে আসে সেখানে 'ট্যাক্‌টিক্‌স্‌' সম্বন্ধেও জনসাধারণের মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। গেরিলাযুদ্ধে সাধারণ সৈন্যদের রণকৌশল খাটেনা; গেরিলারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার একটা নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে। আত্মরক্ষার জন্যে যেখানে গণবাহিনীর সৃষ্টি আবশ্যক সেখানে রণকৌশল সম্বন্ধে জনসাধারণকে একেবারে অজ্ঞ ক'রে রাখা চলে না। সার্বিক যুদ্ধের প্রয়োজনে সমরনীতির ন্যায় রণকৌশলও ক্রমশ সংকীর্ণ সামরিক গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর গণজীবনে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য।

গোড়ার ভুল

চার বছর অন্তে য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছে। পূর্বদিকে সোভিয়েট বাহিনীর ক্রমাগত চাপে জার্মানরা অনেকখানি পশ্চাতে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং মুসোলিনীর পতনের পর বাদোলিও গবর্ণমেণ্টের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে জার্মানীর দক্ষিণাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে বলা যায়। অবশ্য উত্তর ইতালীতে জার্মান হাইকমাণ্ড সামরিক আধিপত্য বিস্তার ক'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে; কিন্তু সমরাস্ত্র থাকতেও যে-মনোবল হারিয়ে ইতালী মিত্র শক্তিবর্গের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে তা সংক্রামক ব্যাধির মতো জার্মানীর আভ্যন্তর জীবনে প্রবেশ ক'রে তার সমরেচ্ছাকেও যে দমিয়ে দেবে না তার নিশ্চয়তা কি?

যুদ্ধে, বিশেষত আধুনিক সার্বিক যুদ্ধে সমরাস্ত্রের চেয়েও বেশী প্রয়োজন সমরেচ্ছার। সমরাস্ত্র থাকতেও কোন জাতি যদি সমরেচ্ছা হারিয়ে ফেলে তবে সমরাস্ত্র কোনোই কাজে আসে না; আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই হোক আর আক্রমণের ক্ষেত্রেই হোক, জাতির সমরেচ্ছাকে জাগ্রত ও অব্যাহত রাখবার জন্যেই রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালানো হয়। অতএব যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে অস্ত্রচালনার মতোই রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালানোও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রচারকার্যে একটু ভুল হ'লে যেমন স্বপক্ষের সমরেচ্ছা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা, তেমনই তার সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষ প্রচারকার্য চালিয়ে নিজেদের মধ্যে সমরেচ্ছা বাড়াতে পারে। যুদ্ধে কোথাও পশ্চাদপসরণকালে সমরাস্ত্র সরাতে না পারলে সেই অস্ত্র হাতে পড়ে প্রতিপক্ষের যেমন শক্তিবৃদ্ধি হয়, আধুনিক যুদ্ধে কোন পক্ষ প্রচারকার্যেও তেমন কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেললে প্রতিপক্ষ তার সুযোগ গ্রহণ ক'রে আত্মপক্ষে প্রচারের সুবিধে পায়। সুতরাং য়ুরোপে নাৎসী জার্মানীর মনোবল নষ্ট করতে হ'লে মিত্রশক্তিবর্গের অত্যন্ত হুঁসিয়ার হয়ে প্রচারকার্য চালানো দরকার। জার্মানীর মনোবল ভেঙ্গে না পড়লে এখনও হিটলারের যে সমরসামর্থ্য রয়েছে তার সাহায্যে আরো কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কেবল অস্ত্রবলের ওপর নির্ভর ক'রে মিত্রশক্তিবর্গ যদি নাৎসী জার্মানীর পতন ঘটাতে চায় তবে তা বিলম্বিত হতে বাধ্য; জার্মানী যখন আক্রমণাত্মক সংগ্রাম ছেড়ে আত্মরক্ষাত্মক সমরনীতি গ্রহণ করেছে তখন যুদ্ধকে বিলম্বিত করা তার দিক থেকে খুব বেশী অবাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয় না। আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে যুদ্ধ চালিয়ে হিটলার হয়তো আর একবার কূটনৈতিক চাল চালবার চেষ্টা করতে পারেন। সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ক্ষেত্রে আজ যে মিলন হয়েছে এই মিলনের সূত্রকে ছিন্ন করবার জন্যে হিটলার হয়তো প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর রাজনৈতিক অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন। সেই অগ্নিপরীক্ষায় মিত্রশক্তিবর্গ উত্তীর্ণ হতে পারবে কিনা সেটাই আজ

বিশেষ ক'রে ভাববার বিষয়। মিত্রশক্তিবর্গের মৈত্রীবন্ধনে কোথাও গলদ থাকলে হিটলারের রাজনৈতিক অস্ত্রাঘাতে তা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; বিশেষত কেবল অস্ত্রবলের ওপর নির্ভর ক'রে নাৎসী জার্মানীকে পর্যুদস্ত করতে গেলে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে তাতে ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধনে কোথাও গলদ থাকলে তা সহজে বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। নাৎসী জার্মানীর পতনই যদি আশু কাম্য হয়, তবে রাজনৈতিক প্রচারকার্য-চালনায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। য়ুরোপে কূটনৈতিক চালে এমন কিছু করা সঙ্গত নয় যাতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনে কোনরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কার সৃষ্টি হতে পারে। সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে কোন কারসাজি করতে গেলে হিটলার পুনরায় "কম্যুনিস্ট জুজুর" ভয় দেখিয়ে প্রচারকার্য চালাবার সুবিধে পাবেন এবং তার ফলে ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট সম্মিলিত দলের শক্তি হ্রাস পাবে। জার্মানীর এবং জার্মান অধিকৃত দেশসমূহের অধিবাসীদের মনে ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারকার্যের ফলে যদি কখনো এ বিশ্বাসের উদ্ভব হয় যে, যুদ্ধান্তে সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দিয়ে য়ুরোপে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি প্রভুত্ব করতে চায় তবে নিশ্চয়ই সেখানকার লোকের মনে এক বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। হিটলার তখন এই ব'লে প্রচারকার্য চালাবার সুযোগ পাবেন যে, গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি চাপিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে যেমন চারদিক থেকে কোনঠাসা ক'রে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিল এবারের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ঘটলেও যুদ্ধান্তে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেভাবেই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবে। এই প্রচারকার্যের ফলে অন্য কোন দেশে না হ'লেও জার্মানদের মধ্যে অন্তত প্রতিরোধস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে যদি এই ধারণা সৃষ্টি করা যায় যে, যুদ্ধান্তে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি কোন প্রভাব বিস্তার না ক'রে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত গবর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে হয়তো

যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে নাৎসী-কবলিত দেশগুলোর জনসাধারণ এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পারে। সেক্ষেত্রে তারা হয়তো সোভিয়েট আদর্শে গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের চেষ্টা করবে; কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তা সহ্য করবে কিনা সেটাই হ'ল আসল কথা। পোলাণ্ডের স্বদেশ-ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্ট ও যুগোস্লাভিয়ার বিশ্বাসঘাতক নেতা মিহাইলোভিশের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এপর্যন্ত যে মনোভাব দেখিয়ে এসেছে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয় যে য়ুরোপের দেশগুলোতে যথার্থ জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট এদের কাম্য কিনা? ফ্রান্সের ব্যাপারে জিরো-দ্য গল সমস্যাটাকে নিয়ে যেভাবে দীর্ঘকাল তালগোল পাকানো হয় তাতেও সন্দেহ বাড়ে ছাড়া কমে না। অবশ্য অনেক ঘোরপ্যাঁচের পর জিরো-দ্য গল সমস্যার একটা সাময়িক সমাধান করা হয় সত্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যাটা আবার প্রকট হয়ে দেখা দেবে কিনা নিশ্চয় ক'রে বলা চলে না। ইতালীর ব্যাপারেও একটা সন্দেহের ছায়াপাত না হয় এমন নয়। মুসোলিনীর পতনের পরই মার্শাল বাদোলিও জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালালেন, অথচ সেই সময়ই মিলান প্রভৃতি স্থানে ইতালীর প্রগতিবাদীরা জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করায় বাদোলিও তাদের কঠোর হস্তে দমন করলেন। বাদোলিও যে ইতালীর প্রগতিবাদীদের নায়ক নন ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা সে কথা ভালোভাবেই জানতেন। বাদোলিওর অতীত জীবন স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল দলের একজন বড় পাণ্ডা। এটা জেনেশুনেও তাঁরা যুদ্ধবিরতির সর্তালোচনাকালে বাদোলিওকে ইতালীর গণ-আন্দোলন দমন করতে দিলেন। গণ-আন্দোলন দমন করবার পর বাদোলিও যখন খানিকটা ঘর গুছিয়ে নিলেন তখন মিত্রপক্ষ মূল ইতালীতে সৈন্য অবতরণ করালো এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষিত হ'ল। বাদোলিওকে রাজতন্ত্রের সমর্থক জেনেও ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি

করলেন; কিন্তু ইতালীতে যে একটা গণশক্তির উত্থানের সূচনা দেখা দিয়েছিল তা স্বীকার ক'রে নেবার জন্যে বাদোলিওর ওপর তাঁরা কোনো চাপ দিলেন না। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই কূটনৈতিক চাল অবস্থার ওপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করে। মিঃ চার্চিল অবশ্য কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ইতালীর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট এই ত্রিশক্তির অনুমোদনক্রমেই গৃহীত হয়েছে; তবে এটা কেবল সামরিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্তাবলী পরে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাদোলিও গবর্ণমেণ্ট এর দ্বারা নাকচ হয়ে যায়নি; পরে রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্তাবলী রচিত হ'লে যে বাদোলিও গবর্ণমেণ্টকে বহাল রেখেই তা রচিত হবে, ইতালী ও মিত্রপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে এযাবৎ যত সংবাদ বেরিয়েছে তা প'ড়ে এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। অর্থাৎ বাদোলিও গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রে নিতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির যে আপত্তির কোনো 'কারণ' নেই এটা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং ঘটনাচক্র যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির রাজনৈতিক লক্ষ্য ক্রমশই যেন কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অথচ এটাই মিত্র-পক্ষের দিক থেকে আজ সব চেয়ে উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর হয়ে ওঠা উচিত। এবারের মহাযুদ্ধে সোভিয়েট শক্তির আবির্ভাবে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে; কাজেই মানুষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে এই যুদ্ধকে বিচার করতে চাচ্ছে এবং যুদ্ধাবসানে জগৎকে নতুন ভাবে দেখবার জন্যেও মানুষের প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। সেখানে প্রহেলিকা, অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা যে লোকের প্রাণে স্বভাবতই সংশয়ের সৃষ্টি করবে একথা আজ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ভালো ক'রে বোঝা দরকার। ফাঁকা বুলি, মিথ্যা আশ্বাস ও স্তোকবাক্য যুদ্ধক্লান্ত জগদ্বাসীর প্রাণে কোনো সাড়া আনতে পারবে না। বরঞ্চ তাতে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই তাদের বারংবার স্মরণ হবে। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে এ মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নানা অছিলায় যে-ভাবে

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রজীবনে হস্তক্ষেপ ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছে তার ইতিহাস লোক বিস্মৃত হয়নি। তার পুনরাবৃত্তি যে হবে না এই আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধান্তে যথার্থ শান্তি স্থাপন সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া কঠিন। য়ুরোপে গত মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছিল সত্য, কিন্তু অশান্তির অনল নির্বাপিত হয়নি। অশান্তির আগুন লেগেই ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাই দাবানল রূপে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর পুঁজিবাদী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো কিভাবে সেই অশান্তির অনলে ইন্ধন যুগিয়েছে এখানে সংক্ষেপে তাই আলোচনা করব।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধ বাধবার পর বৃটেন, ফ্রান্স ও তৎকালীন জার-শাসিত রুশিয়া একত্র হয়ে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করে। গ্রীস কিন্তু তখন নিরপেক্ষ ছিল; তৎসত্ত্বেও মিত্রপক্ষের সৈন্যরা গ্রীসের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে গ্রীক বন্দর সালোনিকা দখল করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মেক্সিকোতে গৃহযুদ্ধ সুরু হ'লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ভিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেই বছরই য়ুরোপে বৃটেন, ফ্রান্স ও জার-শাসিত রুশিয়া নিরপেক্ষ গ্রীসের বিরুদ্ধে আর একদফা অভিযান চালিয়ে করফু ও আরো কয়েকটি গ্রীক দ্বীপ দখল ক'রে নেয়। মিত্র-পক্ষের নৌবহর মূল গ্রীসকে অবরোধ ক'রে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট পরিবর্তন করবার জন্যে চাপ দেয়। তারপর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পারস্য নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সৈন্য রাজধানী তেহ্‌রাণসহ পারস্যের অধিকাংশ এলাকা দখল করে। বৃটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া সেই বছর গ্রীসের ওপর আর একদফা চাপ দেয়। এথেন্সে রাজা কন্‌স্ট্যানটাইনের গবর্ণমেণ্টকে মিত্রপক্ষ অস্বীকার ক'রে সালোনিকায় স্থাপিত এক নতুন গবর্ণমেণ্টকে তারা স্বীকার করে এবং গ্রীসে সৈন্য নামিয়ে রাজা কন্‌স্ট্যানটাইনকে সিংহাসনত্যাগে বাধ্য করে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হস্তক্ষেপের নামে জার্মানী ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রে হেলসিংকি দখল করে। ওদিকে বৃটেন রুশিয়ায় সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের বিরুদ্ধে অভিযান

চালিয়ে মুরমানস্ক বন্দরে বৃটিশ সৈন্য নামায়। ফ্রান্সও সোভিয়েট রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করে। ফরাসী সৈন্যরা গিয়ে ওডেসা বন্দরে অবতীর্ণ হয়। সোভিয়েট রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে অভিযানে জার্মানীও তখন বাদ পড়েনি। ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তির পর জার্মান সৈন্যরা য়ুক্রেন দখল ক'রে আরো এগিয়ে যায়। অতঃপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও ফ্রান্স হাঙ্গারীর আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। রুমানিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াও তাতে যোগ দেয়। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা হাঙ্গারীতে ঢুকে তথাকার কম্যুনিস্ট গবর্ণমেণ্টকে উৎখাতের জন্যে "হোয়াইট"দের সাহায্য করে। সেই বছরই বৃটিশ এবং ফরাসী স্থলসেনা ও নৌবাহিনী সোভিয়েটবিরোধী নায়ক কোলচাক, ডেনিকিন, যুদেনিচ এবং ম্যানারহাইমকে সাহায্য করে। ককেশাস এবং তুর্কীস্তানে বৃটিশ সৈন্যরা সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। বৃটিশ এবং ফরাসী স্থলসৈন্য ও নৌবাহিনী বল্টিক এবং কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েটবিরোধী নায়ক ডেনিকিন ও যুদেনিচকে সাহায্য তো করেই, তদুপরি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করবার জন্যে পোলাণ্ডকেও তারা উস্কায়। এদিকে ইতালী তখন যুগোস্লাভিয়ায় অভিযান চালিয়ে ফিউম দখল ক'রে নেয়। প্রাচ্যে জাপান ১৯১৯ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। জাপানী সৈন্যরা সোভিয়েট এসিয়ার পূর্বাঞ্চল দখল করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সমরোপকরণ ও নৌবাহিনী দিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডকে যুদ্ধে সাহায্য করা হয়। ক্রিমিয়ায় সোভিয়েটবিরোধী নায়ক জেনারেল র‍্যাঙ্গেলও যথেষ্ট সাহায্য পান। সেই বছর পোলাণ্ড কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই পোলিশ সৈন্যের সাহায্যে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিল্না দখল ক'রে নেয়। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। "ফিনিশ হোয়াইট গার্ড দল" উত্তর রুশিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাধাবার প্রয়াস পায় এবং তারা সোভিয়েট-ক্যারেলিয়া আক্রমণ করে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যরা জার্মানীর রুর

জেলা দখল ক'রে নেয় এবং রাইনল্যাণ্ডকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে ফরাসীরা আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করে। সেই বছরই ইতালী গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে করফু দখল করে এবং কিছুকালের জন্যে তা অধিকারে রাখে। পরে রাষ্ট্রসংঘের চাপে ইতালী তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ও মার্কিন নৌসৈন্যরা চীনের হাঙ্কাওতে অবতরণ করে।

সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় আমেরিকার নাইকারাগুয়াতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। সেখানে উদারনৈতিক প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদল যে রাষ্ট্রবিপর্যয় ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে রক্ষণশীলদলকে সাহায্য করে। উদারনৈতিক প্রেসিডেণ্ট নাইকারাগুয়াতে যে-সকল অর্থনৈতিক ও ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রবর্তন ক'রে দেশের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন তাতে বিদেশী স্বার্থের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাকার রক্ষণশীলদলকে সাহায্য করে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত নাইকারাগুয়ায় উদারনৈতিকদল রক্ষণশীলদলকে দাবিয়েই রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন উদারনৈতিক দলের কর্মপথে নানাভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে থাকে। নাইকারাগুয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরিত হয় এবং রক্ষণশীলদলের নেতা জেনারেল দিয়াজ মার্কিন কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করেন। নিরপেক্ষ এলাকায় মার্কিন সৈন্যরা প্রবেশ ক'রে রক্ষণশীলদলের সৈন্যদের মুক্ত করতে আরম্ভ করে এবং তার ফলে উদারনৈতিকদের অসুবিধায় পড়তে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরদপ্তর থেকে জেনারেল দিয়াজকে প্রায় দুলক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র বাকী দেওয়া হয়। ফলে সেখানে ভীষণ গৃহযুদ্ধ বাধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কুলিজ তখন মিঃ স্টিমসনকে দূতরূপে নাইকারাগুয়ায় পাঠান। মিঃ স্টিমসন সেখানে গিয়ে উদারনৈতিক দলের নেতা জেনারেল মনকাবাকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, যদি তিনি ও তাঁর অনুগামীরা অস্ত্রত্যাগ না করেন তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হবে। এই ভীতিপ্রদর্শনের ফলে উদারনৈতিক দলের নেতা গত্যন্তর না দেখে মিঃ

স্টিমসনের প্রস্তাবে রাজী হলেন; কিন্তু জেনারেল সাণ্ডিনোর অধিনায়কত্বে উদারনৈতিক দলের একাংশ উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে থেকে যুদ্ধ চালাতে লাগলো। তারা সংখ্যায় প্রায় শ' পাঁচেক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী আকাশ থেকে মেশিনগান্ দেগে সেই শ' পাঁচেক লোকের মধ্যে প্রায় তিনশ'কে নিহত করলো; এখানে-সেখানে সামান্য প্রতিরোধ হ'ল সত্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শান্ত হয়ে গেল। তারপর নাইকারাগুয়ায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে তত্ত্বাবধান করবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজ জেনারেল ম্যাক্‌কয়কে সেখানে পাঠালেন। নির্বাচনের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে জানালেন যে, নাইকারাগুয়ায় যে পরিবর্তন হয়েছে তা সন্তোষজনক; অর্থাৎ সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন স্বার্থহানি হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপর দেখা যায়, চীনে গৃহযুদ্ধ বাধলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বৃটেন তার প্রায় বিশ হাজার অভিযাত্রী সেনা সাংহাইতে পাঠায় এবং নানকিং-এ গোলাবর্ষণ করা হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা চীনের শানতুং দখল ক'রে নেয়। সেই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাইকারাগুয়ার আভ্যন্তর জীবনে আর একবার হস্তক্ষেপ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ায় চীনা সামরিক প্রভুরা সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে এক অভিযান চালান। সোভিয়েট পরিচালিত 'চাইনিজ ইস্টার্ণ রেলওয়ে' চীনা সৈন্যরা আক্রমণ করে। ব্লাডিভোস্টক বন্দর থেকে সুরু হয়ে মাঞ্চুরিয়ার ভেতর দিয়ে এই রেলপথ গিয়ে ট্রান্স সাইবিরিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অতঃপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের কতকাংশ দখল ক'রে নেয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান ক্রমাগত সোভিয়েট সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে চলে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা চীনের জেহল এবং হোপেই প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইতালী আবিসিনিয়ার সীমান্তে গোলমাল বাধায় এবং "ওয়ালওয়াল-ঘটনার" সৃষ্টি করে। সেই বছরই জাপানীরা আর একবার

চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অন্তর্মোঙ্গোলিয়ায় চাহার প্রদেশের বৃহদংশ দখল ক'রে নেয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ায় ইতালীয় বাহিনীর অভিযান চলে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালী ও জার্মানী প্রত্যক্ষ ভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই জাপানীরা ব্যাপকভাবে চীন আক্রমণ করে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া জার্মানীর কুক্ষিগত হয়। সেই বছরই হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার কতকাংশ দখল ক'রে নেন। প্রথমে পোলাণ্ড ও হাঙ্গারী হিটলারকে এই ব্যাপারে সমর্থন করেন; পরে মিউনিকে বৃটেন এবং ফ্রান্সও হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া-দখল স্বীকার ক'রে নেয়। ওদিকে পোলাণ্ড তখন লিথুয়ানিয়াকে এক চরম পত্র দিয়ে তার বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করে, কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ আর তখন বাধতে পারেনি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কার্যত চেকোস্লোভাকিয়ার প্রায় সবটাই হিটলারের অধিকারে যায়। সেই বছরই জার্মানী লিথুয়ানিয়াকে এক চরমপত্র দিয়ে মেমেল দখল করে। ইতালীও সুযোগ বুঝে আলবেনিয়াকে দখলে আনে। তারপর আরম্ভ হয় জার্মানীর পোলাণ্ড-অভিযান এবং তাতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট শক্তি রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে। যোগদানের পর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ লিটভিনফ রাষ্ট্রসংঘের মারফৎ বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৃটেন ও ফ্রান্স কিন্তু তাতে বেশী গা মাখেনি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তি তাদের অজ্ঞাত ছিল এমন নয়; ফাসিস্ত ও নাৎসী শক্তিকে দমন করতে হ'লে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন একথাও তারা মনে মনে উপলব্ধি করত; কিন্তু ধনিক-পরিচালিত বৃটিশ ও ফরাসী সরকার সাম্যবাদী সোভিয়েট শক্তিকে অতখানি উচ্চাসন দিতে কুণ্ঠিত ছিল। এজন্যই রাষ্ট্রসংঘে যোগদানের

পর দীর্ঘ সাড়ে চার বছর কাল একান্তভাবে চেষ্টা ক'রেও মঃ লিটভিনফ বৃটেন ও ফ্রান্সের কর্ণধারগণের হৃদয় জয় করতে পারেন নি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার যখন অস্ট্রিয়া গ্রাস করলেন তখন মঃ লিটভিনফ আর যাতে সেরূপ না হতে পারে তজ্জন্য শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের এক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করলেন। বৃটিশ সরকার তাতে রাজী হলেন না। তারপর যখন সেই বছরই গ্রীষ্মকালে হিটলার সুদেতানল্যাণ্ডে গোলযোগ বাধালেন তখনও সোভিয়েট শক্তির কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। পরে বরঞ্চ সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দিয়ে তলে তলে মিউনিক চুক্তি হয়ে গেল, হিটলারের যূপকাষ্ঠে চেকোস্লোভাকিয়াকে বলি দেওয়া হ'ল। সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দেবার কারণ ব্যাখ্যায় বৃটিশ সরকার বললেন, সোভিয়েট শক্তিকে ডাকলে হিটলার-মুসোলিনী মিউনিক বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃত হতেন। অথচ মিউনিক চুক্তির পূর্বে ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক ইস্তাহারে বলা হয়, হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র একযোগে তাতে বাধা দেবে। মজার ব্যাপার এই যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করেই কমন্সসভায় এরূপ উক্তি করা হয়েছিল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন। সকলেরই তখন আশঙ্কা, রুমানিয়া বুঝি যায়। মঃ লিটভিনফ তখন আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, অবিলম্বে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, রুমানিয়া তুরস্ক, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—এই ছ'শক্তির এক সম্মেলন আহ্বান করা হোক; তাদের কেউ আক্রান্ত হ'লে যাতে আর সকলে তাকে রক্ষার জন্যে অগ্রসর হয় তেমন একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বৃটিশ সরকার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন, তাতে নাকি চলবে না— অবস্থা সঙ্গীন, আরো দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটানো চাই।

কিন্তু পরবর্তীকালে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির আলোচনায় দীর্ঘসূত্রতা দেখে মনে হয় না যে, বৃটিশ সরকারের মধ্যে তেমন কোন ব্যগ্রতা বা উৎকণ্ঠা ছিল। ১৯শে মার্চ ছ'শক্তি সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর বৃটিশ সরকার প্রস্তাব করলেন বৃটেন, ফ্রান্স, পোলাণ্ড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—এদের কেউ যদি জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয় তবে উক্ত চার শক্তি মিলে পরামর্শপূর্বক যা হয় করবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বুঝল, অবস্থা অনুসারে এ ব্যবস্থা মোটেই পর্যাপ্ত নয়, তথাপি এ প্রস্তাবে সে রাজী হ'ল। কিন্তু পোলাণ্ড তাতে সম্মত হ'ল না। না হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ সে বুঝতে পারল তাতে তার লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। কেননা তা ক'রে জার্মানীকে যতখানি চটানো হবে, মিত্রশক্তির নিকট থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস ততখানি পাওয়া যাবে না। মুখের কথায় তার পেট ভরবে না, তার প্রয়োজন যথার্থ সাহায্যের।

ছ'শক্তি সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বারোদিন পর অর্থাৎ ৩১শে মার্চ বৃটেন যখন বুঝতে পারল জার্মানী কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রান্ত হতে আর বেশী দেরী নেই, তখন সে অকস্মাৎ পোলাণ্ডকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলো। সেদিন প্রাতে বৃটিশ মন্ত্রিসভার বৈঠক হবার পর তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স লণ্ডনস্থ সোভিয়েট দূতকে তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অপরাহ্ণে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভায় একথা ঘোষণা করতে পারেন কি না যে পোলাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-দানে সোভিয়েট শক্তিরও সম্মতি আছে। কিন্তু সোভিয়েট দূত এ সম্বন্ধে তখন কি বলবেন! তাঁর ওপর তো সেরূপ কোনো নির্দেশ ছিল না।

অথচ তারই এক বছর পূর্বে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলেছিলেন, "কোনো শক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়ার দলবদ্ধ হবার নামই কি ঐকত্রিক নিরাপত্তা?......আমি বলি, শান্তির পরিবর্তে তা আরো আমাদের যুদ্ধের দিকেই নিয়ে যাবে।"

আর তার এক বছর পরই কমন্স সভায় সার জন সাইমন একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপনে বৃটিশ সরকারের কোনো আপত্তি নেই।"

আপত্তি না থাকলেও যে বিশেষ আগ্রহ ছিল এমন প্রমাণও নেই। সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না ক'রে এভাবে সোভিয়েট দূতকে প্রশ্ন করবার অর্থই তাঁকে অপ্রস্তুত করা। এই মৌখিক ভদ্রতার মধ্যে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিল বলে মনে হয় না।

এর পর ১৩ই এপ্রিল বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে, রুমানিয়া আক্রান্ত হ'লে তাকে সাহায্য করা হবে। গ্রীসকেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি সেই একই তারিখে দেওয়া হয়। গ্রীসকে প্রতিশ্রুতি দেবার সিদ্ধান্ত হয় ঠিক ১৩ই এপ্রিল সকাল বেলা। এই প্রতিশ্রুতি দেবার জন্যে মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফাক্সের ওপর চারদিক থেকে চাপ পড়ে; ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ের জানান যে, বৃটেন যদি তাতে রাজী না হয়, ফ্রান্স একাই রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবে। সকলেরই তখন ভয়, রুমানিয়া হস্তগত হ'লে হিটলারের আর তেল-গমের অভাব হবে না; বৃটিশ অবরোধনীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে সে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হবে। এই সব চাপে পড়েই বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে শেষমুহূর্তে রুমানিয়ার নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ণে রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত কমন্স সভায় এসে যখন কূটনীতিকদের আসনে উপবেশন করলেন তখনও পর্যন্ত তিনি জানেন না যে, তাঁর দেশকে নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে কি না। তাঁরই পাশে জানালার ধারে দূতাবাসের সাংবাদিক একখানি কালো ও একখানি সাদা রুমাল নিয়ে বসেছিলেন। বাইরে জানালার কাছেই রুমানিয়ার একজন লোক অপেক্ষা করছিল। সাংবাদিক যখন জানালা দিয়ে সাদা রুমাল উড়িয়ে দেখালেন তখন বাইরের লোকটি ছুটে

দূতাবাসে গেল বুখারেস্টে খবর পাঠাতে। খবর আর কিছুই নয়, বৃটেন রুমানিয়াকে বিপদে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যে ঘেরা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পোলাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবে কি না তা জানবার জন্যে সোভিয়েট দূতের ডাক পড়ল, অথচ রুমানিয়াকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার বেলা তার দূতকে পূর্বাহ্নে কিছু জানানো দরকার হ'ল না। একে রাজনৈতিক ভেল্কীবাজী ছাড়া আর কি বলা যায়।

সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দিয়ে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে পোলাণ্ড, গ্রীস ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সোভিয়েট শক্তির কিন্তু সুবিধেই হ'ল। বল্কান থেকে বল্টিক পর্যন্ত তার পশ্চিম সীমান্তবর্তী দেশগুলো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেল, কিন্তু তাতে তার কোনো দায়িত্ব রইল না। বৃটিশ ও ফরাসী ধুরন্ধরগণ আবার এখানে চালে ভুল করলেন। এই প্রতিশ্রুতি দানের ব্যাপারে সোভিয়েট শক্তিকে জড়াতে পারলে জার্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি আরম্ভ হ'ত এবং তার ফলে জার্মান-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তির বীজ অঙ্কুর মেলবারও অবকাশ পেতো কিনা সন্দেহ।

অতঃপর ১৫ই এপ্রিল বৃটেন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বললো যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো সেও এককভাবে পোলাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিক। ১৭ই এপ্রিল সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানিয়ে পাল্টা প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন যে, এককভাবে পোলাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো লাভ হবে না; বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের একত্র হয়ে এই চুক্তি করা দরকার যে, তাদের কেউ আক্রান্ত হ'লে একে অন্যকে সাহায্য করবে; এতদ্ব্যতীত বল্কান থেকে বল্টিক সাগর পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে হবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে বাইশ দিন কাটিয়ে দিলেন এবং ৯ই মে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ১৫ই এপ্রিল তারিখের কথাই আবার

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট পাড়লেন। ইতিমধ্যে সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরে পরিবর্তন ঘটলো। মঃ লিটভিনফের স্থলে মঃ মলোটফ সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হলেন। বার্লিনে তখন যিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি বুঝতে পারলেন, একটা বিপদ আসন্ন। প্যারিসে তিনি খবর দিলেন, বৃটেন ও ফ্রান্স তাড়াতাড়ি সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে চুক্তি না করলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো জার্মান-সোভিয়েট চুক্তি হয়ে যাবে।

এই আভাস পাওয়া সত্ত্বেও বৃটেন এবং ফ্রান্সের গড়িমসি ভাব দূর হ'ল না। ১৪ই মে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, ১৭ই এপ্রিল তাঁরা যা জানিয়েছেন তাতে কোথাও অসঙ্গতি কিছু নেই, কাজেই সেরূপ প্রস্তাবে বৃটেনের আপত্তি কেন ? বৃটেন তা নিয়ে আবার দুসপ্তাহ কাটিয়ে দিল এবং ২৭শে মে সে নতুন কতকগুলো প্রস্তাব ক'রে পাঠালো। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তার জবাব দিলেন ২রা জুন।

অবস্থা যেখানে জরুরী সেখানে এরূপ ঢিলেমি কিছুতেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। এত জটিল ব্যাপারে উচিত ছিল একজন বৃটিশ মন্ত্রীর অবিলম্বে মস্কো গিয়ে খোলাখুলি সমস্ত আলোচনা করা। সেই সময় কমন্স সভায় কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে, পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের নিজেরই মস্কো যাওয়া উচিত। মিঃ চেম্বারলেন তাতে নারাজ। যুক্তি কিছু তিনি দেখালেন না, বললেন—দরকার নেই।

লর্ড হ্যালিফাক্সকে না পাঠিয়ে পাঠানো হ'ল পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী মিঃ উইলিয়ম স্ট্র্যাংকে। তিনি ১৫ই জুন গিয়ে মস্কো পৌছলেন। তাঁকে দেখে মঃ মলোটফ বেশী খুসী হলেন না। মিঃ স্ট্র্যাং অযোগ্য ব্যক্তি বলে নয়, সমানে সমানে আলোচনা চালাবার জন্যে তাঁরা বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবকেই আশা করেছিলেন। তৎস্থলে একজন কর্মচারী যাওয়ায় সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবের আত্মমর্যাদাবোধে ঘা লাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত সোভিয়েট তরফ থেকে আধা-সরকারীভাবে লর্ড হ্যালিফাক্সকে আমন্ত্রণও করা

হয়েছিল। তার পরে বৃটেনের এতাদৃশ আচরণে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্টই সঙ্গত কারণ ছিল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে আগস্ট মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত মস্কোতে ইঙ্গ-সোভিয়েট কূটনৈতিক আলোচনা চলে। বৃটেনের পক্ষ থেকে মস্কোতে যাঁরা আলোচনা চালান নিজ দায়িত্বে তাঁদের কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না। নতুন কোনো প্রশ্ন উঠলেই তৎসম্পর্কে লণ্ডন থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে তাঁদের অপেক্ষা করতে হ'ত। লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষও সেই নির্দেশ পাঠাতে খুব তৎপরতা দেখাতেন এমন নয়। কমন্স সভায় অধীর হয়ে কোন কোন সদস্য যখন জিজ্ঞাসা করতেন, আলোচনার কতদূর কি হ'ল? উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলতেন, "খেলার বল এখন মাঠের অপর ধারে"—অর্থাৎ সর্বশেষে তিনি যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন মস্কো থেকে তার উত্তর তখনো আসে নি।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। চুক্তির সর্ত এক রকম ঠিক, কিন্তু মুস্কিল বাধলো 'পরোক্ষ আক্রমণ' কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ নিয়ে। পরোক্ষ আক্রমণে হিটলার সিদ্ধহস্ত; কোন দেশের ওপর তিনি যে অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়েন এমন নয়, উস্কানী দিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র দেশ-গুলোতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তোলেন এবং পরে সেখানে সংখ্যালঘু জার্মানদের স্বার্থরক্ষা ও শান্তিশৃংখলার ধূয়া তুলে নিজের মতলব হাসিল করেন। এই শ্রেণীর পরোক্ষ আক্রমণ কিভাবে রোধ করা যায় তাই হ'ল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মঃ মলোটফ তখন প্রস্তাব করলেন যে, এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'লে তিন দেশের সমরনায়কগণের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। হিটলারকে সামরিক বলে বাধা দিতে হ'লে কোথায় কার কিভাবে কতটুকু শক্তি নিয়োগ করতে হবে তার একটা বোঝাপড়া না হ'লে চলে না। অতএব বৃটেন ও ফ্রান্স যেন তাদের সমর-বিশারদদের আলোচনার জন্যে মস্কো পাঠান। এই সামরিক আলোচনা শেষ

না হওয়া পর্যন্ত মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হবে না বলে সোভিয়েট সরকার স্থির করেন।

বৃটেন ও ফ্রান্স সেই প্রস্তাবে রাজী হ'ল সত্য, কিন্তু গড়িমসি চাল তাদের কিছুতেই গেল না। এবারও তারা পূর্বের মতোই ভুল করল। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী থেকে তারা মস্কো পাঠাবার জন্যে এমন সব লোক নির্বাচন করল যাঁদের সমর-বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ কোনই প্রতিষ্ঠা নেই। সমরবিদ্যায় তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের পর্যায়ে পড়েন। কেবল তাই নয়, এমন জরুরী অবস্থায় যেখানে বিমানযোগে তাঁদের পাঠানো উচিত ছিল সেখানে পাঠানো হ'ল তাঁদের এক মন্থরগতি বাণিজ্যপোতে। পাঁচ দিনে সেই জাহাজ গিয়ে লেলিনগ্রাডে পৌঁছল। রুশগণ ঠাট্টা ক'রে তাকে বললো, 'গাধাবোট'। তারা আরও বললো, "আমরা আশা করেছিলাম গ্যামর্লা (তৎকালীন ফরাসী প্রধান সেনাপতি) ও গর্ট (বৃটিশ প্রধান সেনাপতি) আসবেন, কিন্তু পাঠানো হ'ল এমন অখ্যাত লোক যাঁরা মঃ ভরোশিলফের (তৎকালীন সোভিয়েট প্রধান সেনাপতি) সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলবার অযোগ্য"।

যাই হোক, এর জন্যে আলোচনা বন্ধ রইল না। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে বৃটেন ও ফ্রান্স কি কি করতে প্রস্তুত সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করলেন। আলোচনার গতিক দেখে মস্কোস্থিত বৃটিশ দূত এবং সামরিক প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে যে বৃটিশ নৌসেনাপতি গিয়েছিলেন তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করলেন। তাঁরা জানালেন, আলোচনা খুব চমৎকারভাবে চলেছে।

তারপর এল সোভিয়েটের পালা। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে বৃটেন ও ফ্রান্সের মিত্রশক্তিরূপে সে কি করবে? মঃ ভরোশিলফ যে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে দেখা গেল, ভিল্‌নার পথে উত্তর-পূর্ব পোলাণ্ডে ও লাও-এর পথে দক্ষিণ-পূর্ব পোলাণ্ডে সোভিয়েটের লাল ফৌজের প্রবেশ করা দরকার

হবে। জার্মান বাহিনীর মুখোমুখি হতে হ'লে এছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু এই প্রস্তাব পোলাণ্ডের নিকট উপস্থিত করা হ'লে সে তা প্রত্যাখ্যান করল।

পোলাণ্ডের শাসকদের একগুঁয়েমির ফলে আলোচনা ফেঁসে যাবার উপক্রম হ'ল। বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রেই তাঁরা সোভিয়েটের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এখানে আরো একটি কথা বলবার আছে। পাঁচ মাস পূর্বে বৃটেন ও ফ্রান্স পোলাণ্ডকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ এই পাঁচ মাসের মধ্যে তারা পোল ও রুশদের মুখোমুখি আলোচনার জন্মে কোথাও একত্র করবার চেষ্টা করেনি। মুখোমুখি আলোচনায় পরস্পরের ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের অনেকখানি হয়ত নিরসন হতে পারত। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের কূটনীতিকগণ এই সহজ সত্য কথাটা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারলেন না। খোলাখুলি আলোচনা না হবার ফলে পোলাণ্ডের শাসকগণ মনে করলেন, সোভিয়েটের প্রস্তাবের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা কুমতলব আছে। তাই তাঁরা সোভিয়েটের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন।

পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস'তে তখন বৃটেন ও ফ্রান্সের দূত পোলিশ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিলেন। দুদিন পর পোলাণ্ডের কর্তারা সোভিয়েটের সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃত হলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনীতির চাকা অন্যদিকে ঘুরে যায়। ২২শে আগস্ট মস্কোস্থিত বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিরা যখন এই শুভবার্তাটা দিতে গেলেন মঃ মলোটফ তখন মৃদুহাস্যে তাঁদের জানালেন, সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবার জন্মে জার্মান পররাষ্ট্র সচিব হের রিবেনট্রপ মস্কো রওনা হয়েছেন।

এই সংবাদে বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল কি না বলা যায় না, তবে তাঁদের প্রসন্ন বদন যে মুহূর্তে মলিন হয়ে গিয়েছিল একথা নিঃসন্দেহেই অনুমান করা চলে।

এর জন্মে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাবার কম চেষ্টা

করা হয় নি। কিন্তু সত্যিই কি সে দোষী? আগাগোড়া বৃটেন ও ফ্রান্সের ধনিক-গোষ্ঠী-পরিচালিত শাসকগণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যেমন বিরূপ মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন এবং তার শান্তির প্রস্তাব যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে বৃটেন ও ফ্রান্সের ওপর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের একান্তভাবে নির্ভর করা কঠিন ছিল। শেষকালেও বল্টিক তীরবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েটের সঙ্গে যেরূপ টালবাহনা আরম্ভ করেছিল তাতে বৃটিশ ও ফরাসী সততায় সন্দিহান হ'লে তার জন্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া চলে না। পরবর্তীকালে রুশ-ফিন যুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের মনোভাব অতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোর দুর্দিনে এতখানি সহানুভূতির সুর কারো কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হয় নি, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের দুঃখে সে কি কান্নার রোল! কুইকাতলা থেকে আরম্ভ ক'রে চুণোপুঁটি পর্যন্ত সকলের সে কি লম্ফঝম্ফ! রাষ্ট্রসংঘ থেকে "অপরাধী" সোভিয়েটের নাম কেটে তবে সোয়াস্তি।

এহেন বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করা একমাত্র জার্মানীর আক্রমণভয়ে! কাজেই সোভিয়েট তার সোজা পথ বেছে নিল। জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ক'রে নিজেকে সে নিরাপদ করলো। হিটলারের ভয় দেখিয়ে সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে যারা কোমর বেঁধে দর কষাকষি আরম্ভ করেছিল তাদের মুখ শুকিয়ে চূণ হয়ে গেল।

কূটনৈতিক খেলায় কেউ ট্যাঁক খুলে সমস্ত দেখিয়ে দেয় না একথাটা বৃটিশ ও ফরাসী ধুরন্ধরগণের অবশ্যই তখন বোঝা উচিত ছিল। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তির আভাস তাঁরা পূর্বে না পেয়েছিলেন এমন নয়। ৭ই মে থেকে বার্লিনস্থ ফরাসী দূত মঃ কোলদ্রেঁ বারংবার ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে সাবধান ক'রে দিতে থাকেন যে, হিটলার ও রিবেনট্রপ একটা সোভিয়েট-জার্মান চুক্তির চেষ্টায় আছেন, কাজেই অবিলম্বে তৎপূর্বে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট

চুক্তি হওয়া একান্ত দরকার। জুন মাসের প্রথমভাগে মঃ কোলদ্রেঁ আরো জানান যে, বার্লিনস্থ বৃটিশ দূত সার নেভিল হেণ্ডারসনও তাঁর অভিমত সমর্থন করেছেন এবং তদনুসারে মস্কো-আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে অগৌণে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করবার জন্যে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেছেন। এমন কি আগস্ট মাসের মাঝামাঝিও মঃ কোলদ্রেঁ বিশেষ জোর দিয়ে লেখেন, "যে-কোনভাবেই হোক, রুশিয়ার সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যাপার চুকিয়ে ফেলতে হবে। পোলাণ্ডের ওপর জার্মানীর আক্রমণ বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হ'ল রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।"

কাজেই দেখা যায়, রুশ-জার্মান চুক্তি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলে যে যতই চেঁচামেচি করে থাকুক আসলে ব্যাপারটা বৃটেন ও ফ্রান্সের কর্তারা অনেক আগেই জানতেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রাতারাতি মত বদলে বৃটেন ও ফ্রান্সকে প্রতারিত করেছে এটা জোর গলায় বলে বেড়াবার জন্যেই "না জানার" ভাণ করা হয়। ২২শে আগস্ট মিঃ চেম্বারলেনের মুখ দিয়ে বেরুয় যে, সেদিনই প্রথম তিনি সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি হতে পারে এমন একটা কথা শুনতে পান। এত কিছুর পরও কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর কাণে তার আগে এসম্বন্ধে কোন কথাই পৌঁচেছিল না?

আসল কথা, বৃটেন ও ফ্রান্সের তৎকালীন মুরুব্বিগণ বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কোন চুক্তি হতে পারে। এখানে হিটলারই বৃটেন ও ফ্রান্সকে ফাঁকি দেন। আগাগোড়া কম্যুনিস্ট রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ ক'রে তিনি বৃটেন ও ফ্রান্সের ধনপতিপক্ষচ্ছায়াপুষ্ট তদানীন্তন শাসকদের চক্ষে ধূলি দিয়ে আসেন; তাঁদের মনে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মান যে, কম্যুনিস্ট রুশিয়ার সঙ্গে নাৎসী-জার্মানীর কখনো মিতালি হতে পারে না। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয় যখন ঘরে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, তখন জার্মান পররাষ্ট্র সচিব

বিমানে মস্কো গিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে এলেন। হিটলার কূটনৈতিক খেলায় বৃটেন ও ফ্রান্সের ওপর টেক্কা মারলেন।

জার্মানী একদিকে নিশ্চিন্ত হ'ল। পূর্বদিকে পোলাণ্ডের ভয় তার ছিল না—ছিল সোভিয়েট শক্তির। তাকে নিরস্ত করতে পেরে হিটলার প্রত্যক্ষভাবে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহসী হলেন। ডানজিগ উপলক্ষ্য করে য়ুরোপে এক মহাসমর বেধে গেল।

অতএব দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধ থেকে এ মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত যে পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে তাতে জগতে প্রকৃত শান্তি কখনো ছিলনা। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পরদেশ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে কাড়াকাড়িটা আগাগোড়াই চলে আসছিল। সোভিয়েট পক্ষ থেকে যখনই কোন প্রকৃত শান্তির প্রস্তাব এসেছে তখনই তা অগ্রাহ্য হয়েছে। বর্তমান মহাযুদ্ধের শেষ হ'লেও সেই ভাবটাই চলবে কিনা তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

একটা কথা আছে, "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে"। কিন্তু যাঁরা জগতের নিত্যপরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী তাঁরা একথা স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁদের মতে যে অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল জগৎ সে অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। কিন্তু এযুদ্ধের পর পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি না হ'লেও পুরাতন সমস্যা যে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেবেনা এমন কথা জোর ক'রে বলা চলে না। একমাত্র ভরসার কথা, এবারের সর্বিক যুদ্ধে শ্রমিকদের ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই আমরা তার খানিকটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। ভারতেও এই যুদ্ধের সময় শ্রমিকশ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে অবশ্য শ্রমিকদের অনেক দাবী এখন এড়িয়ে চলা যাচ্ছে; কিন্তু যুদ্ধান্তে স্বাভাবিক অবস্থায় সেইসব দাবী অগ্রাহ্য করা হয়ত কঠিন হবে। শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দাবীই ভাবী জগতের পক্ষে একমাত্র আশার কথা এবং পুঁজিবাদীদের সোভিয়েট-বিরোধী কার্যকলাপের পথে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় প্রতিবন্ধক।

সার্বিক যুদ্ধ

"টোটালিটারিয়ান ওয়র" বা আধুনিক সার্বিক যুদ্ধের জন্মদাতা জার্মান জেনারেল ফন লুডেনডর্ফ। গত মহাযুদ্ধে জার্মান সমরপ্রচেষ্টার তিনিই ছিলেন প্রধান পরিচালক এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার 'বার্লিন-অভিযান' ক'রে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে যে ষড়যন্ত্র করেন তাতে ফন লুডেনডর্ফের যথেষ্ট সহায়তা ছিল। নাৎসী দলের অভ্যুত্থানের ফলে অবশেষে জার্মানীতে যখন টোটালিটারিয়ান শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ ফাসিস্ত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ডিক্টেটর লাভ করলেন, তখন লুডেনডর্ফ ভাবী সার্বিক যুদ্ধের এক পূর্ণ চিত্র আঁকলেন। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট ছিল; কাজেই ভাবীকালের সার্বিক যুদ্ধে যাতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ভুলভ্রান্তিগুলো আর না ঘটে তার জন্যে তিনি বিশেষভাবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে জার্মানদের সমরপ্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল বিখ্যাত প্রুশিয়ান সমর-বিশারদ ক্লাউজভিৎসের সামরিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জার্মান সামরিক চিন্তাধারার ওপর ক্লাউজভিৎসের প্রভাব শতাধিক বর্ষকাল অসম্ভব ভাবে চলে। ক্লাউজভিৎসের নীতি ছিল, "কোন সমস্যার সমাধান রক্তাক্ত পথেই সম্ভব, যুদ্ধের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য হ'ল প্রতিপক্ষের বাহিনীকে ধ্বংস করা।...বড় যুদ্ধের দ্বারাই বড় ফললাভ সম্ভব। রক্ত দিয়ে বিজয় লাভ করতে হয়।...রক্তপাত ছাড়া যুদ্ধে জয়ের কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন প্রয়োজন নেই।"

প্রচুর রক্তপাত না ক'রেও প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র ও জয় করবার যে একটা কৌশল থাকতে পারে, তা যে রণনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া সম্ভব—একথা ক্লাউজভিৎস কিছুতেই স্বীকার করতেন না। সেরূপ

চিন্তাধারাকে তিনি "বিশ্বপ্রেমিকের কল্পনা" বলে উড়িয়ে দিতেন। ক্লাউজভিৎসের নীতি অন্ধভাবে অনুসৃত হবার ফলে জার্মান জেনারেলদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথম সুযোগেই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; তার জন্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা না করলেও চলে। সেজন্যেই ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের রণকৌশল কেবল একটা বিপুল হত্যার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হিটলার তাঁর সার্বিক যুদ্ধে ক্লাউজভিৎসের সেই নীতির একেবারে পরিবর্তন ক'রে দিয়েছেন। হিটলারের মতে যুদ্ধ একটা জীবনস্বরূপ—নতুন পথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে একে পরিচালিত করতে হবে যাতে 'মূল্যবান জার্মান শোণিত' যথাসম্ভব রক্ষা পেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে নেপোলিয়ঁও ঠিক এরূপ কথাই বলেছিলেন, "যতদূর সম্ভব কম রক্তপাত ক'রে যুদ্ধে জয়লাভ করাই আমার লক্ষ্য"। কিন্তু এই লক্ষ্যসাধনে হিটলার নেপোলিয়ঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। হিটলার তাঁর আত্মচরিতের এক স্থানে বলেছেন,—

"অন্য কোন পথে উদ্দেশ্য সাধন না করতে পেরেই লোক হত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু এই হত্যার পথ অবলম্বন ছাড়াও একটা বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজি বা রণনীতি আছে, সেই স্ট্র্যাটেজির প্রধান অস্ত্র বুদ্ধি। অন্য ভাবে আমি যদি সহজে এবং স্বল্প মূল্যে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি, তবে শত্রুর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্যে আমি সামরিক উপায় অবলম্বন করতে যাব কেন? আমাদের স্ট্র্যাটেজি হ'ল শত্রুকে ভেতর থেকে আক্রমণ করা; নিজের দৌর্বল্যে সে যাতে নিজেই ভেঙ্গে পড়ে তার চেষ্টা করা।"

পররাজ্য গ্রাসের সময় হিটলার সেখানকার আভ্যন্তর শৃংখলা নষ্টের জন্যে প্রচ্ছন্ন বাহিনী (Fifth column), প্রচারকার্য এবং ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা কি ভাবে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, নতুন ক'রে সেই সম্বন্ধে কিছু না বললেও বোধ হয় চলে। বিপক্ষের মধ্যে 'স্নায়ুযুদ্ধ' সৃষ্টিই হিটলারী স্ট্যাটেজির

প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত উপায়সমূহের দ্বারা হিটলার যেখানে সম্পূর্ণরূপে কার্যোদ্ধারে অসমর্থ হয়েছেন কেবল সেখানেই তিনি সামরিক বল প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু একমাত্র সামরিক বলের ওপর তিনি নির্ভরশীল নন; তাঁর সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনায় সাকার নিরাকার দুপ্রকার অস্ত্রেরই সমান স্থান; যেখানে যেটি পারেন তিনি প্রয়োগ করেন।

সে যাই হোক, স্ট্র্যাটেজি নিরূপণে হিটলারের স্বকীয়তা থাকলেও সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনায় তিনি জেনারেল লুডেনডর্ফের নিকটই ঋণী। জেনারেল লুডেনডর্ফই প্রথম ক্লাউজভিৎসের সমরনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ক্লাউজভিৎসের নীতিতে যুদ্ধে অপরিসীম হিংস্রতা ও ব্যয় সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীনতার সমর্থন রয়েছে বলে যে লুডেনডর্ফ তার তীব্র সমালোচনা করেন এমন নয়; বরঞ্চ লুডেনডর্ফও সেই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত। মতবিরোধ হ'ল লক্ষ্য ও পথ নিয়ে।

ক্লাউজভিৎসের মতে,—

"The political goal is the end and warfare is a means leading to it and a means can never be thought of without a certain end."

অর্থাৎ—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনই চরম লক্ষ্য এবং যুদ্ধ হ'ল সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ। লক্ষ্য ছাড়া কোন পথ নির্ণীত হতে পারে না।

অতএব দেখা যায়, ক্লাউজভিৎস সামরিক নীতিনির্ধারণে কূটনীতির ওপর জোর দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। জেনারেল লুডেনডর্ফ এই সামরিক ব্যাপারের উর্ধে কূটনীতিকে স্থান দেবারই বিরোধী। তিনি বলেন,—

"The totalitarian principle demanded that in war a nation should place everything at its service; and in peace, at the service of the next war. War was the highest expression of the national 'will to live' and

politics must therefore be subservient to the conduct of war."

অর্থাৎ—সার্বিক নীতিই হ'ল এই যে, যুদ্ধের সময় জাতিকে তার সমস্ত শক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে এবং শান্তির সময় পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। জাতির বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের চরম উপায় যুদ্ধ। অতএব রাজনীতি সমরনীতির অনুগামী হবে।

সুতরাং ক্লাউজভিৎস ও লুডেনডর্ফের মতবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, ক্লাউজভিৎস মনে করতেন যুদ্ধ রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছবার উপায়, আর লুডেনডর্ফের মতে যুদ্ধের কোন লক্ষ্য নেই—তার মধ্য দিয়েই জাতির আত্মবিকাশ হয়। সমগ্র জাতিকে একটা সৈন্যদলে পরিণত করবার মধ্যেই তার লক্ষ্য নিহিত।

লুডেনডর্ফের এই চিন্তাধারা কিছু নতুন নয়। গ্রীক ইতিহাসে দেখা যায়, স্পার্টাও একদিন এরূপ চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার ফলে স্পার্টার রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় এমন সংকীর্ণতা এসে স্থান পেয়েছিল যে, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো তার সমস্ত জাতীয় জীবন ভেতর থেকে অবশ হয়ে পড়েছিল। লুডেনডর্ফের চিন্তাধারার মধ্যেও ঠিক তেমনই একটা বৃহত্তর স্পার্টা-গঠনের প্রয়াস দেখা যায়। জাতিকে যুদ্ধকামী করবার জন্যে তিনি সর্বাগ্রে জনসাধারণের বাহ্যিক ঐক্যের ওপর বেশী জোর দেন। সেই বাহ্যিক ঐক্য আনয়নের জন্যেই উগ্র জাতীয়তাবাদ একান্ত আবশ্যক। তাঁর মতে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী জাতি মনে করবে যে সার্বিক যুদ্ধের দায়িত্ব বহনের জন্যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেই তারা ধন্য। পুরুষজাতি মনে করবে যে সার্বিক যুদ্ধের জন্যে সমস্ত শক্তিঅর্জনই তাদের পবিত্র কর্তব্য। অর্থাৎ হত্যাই যেন জীবনধারণের চরম সার্থকতা। জাতির বাহ্যিক ঐক্য বিধানের আর একটা পন্থা লুডেনডর্ফ বাৎলান যে, হাইকমাণ্ডের বিরোধী কোন মতামত কেউ প্রকাশ করলে, এমন কি মনে পোষণ করলেও তাকে দমন করতে হবে।

বিরুদ্ধ মতবাদ দমনের ব্যবস্থা কিছু নতুন নয়; কিন্তু লুডেনডর্ফ তার ওপর অত্যধিক জোর দেন।

সার্বিক যুদ্ধের জন্যে রাষ্ট্রের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও লুডেনডর্ফ বিশেষ গুরুত্ব অরোপ করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই সামরিক বল নির্ভর করে। কিন্তু অর্থনীতির ওপর জোর দিলেও লুডেনডর্ফ এই বিষয়ে ক্লাউজভিৎসের সঙ্গে একমত যে, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করাই একমাত্র সামরিক লক্ষ্য। অথচ হিটলারের মতে সমর-নায়কের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে রণ ছাড়াই প্রতিপক্ষের বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যায়।

বর্তমান মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে লুডেনডর্ফ মনে করতেন যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাই প্রচণ্ডতর হয়ে উঠবে। তাঁর মতে আক্রমণকৌশল এরূপ হওয়া উচিত :—গোলন্দাজ, মেশিনগান, মর্টার এবং ট্যাঙ্কবাহিনীর সাহায্যে পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয়ে অবশেষে হাতাহাতি সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করবে। রক্তাক্ত যুদ্ধের দিকেই থাকবে সব কিছুর গতি; যন্ত্রসজ্জার ফলে সেই গতি বৃদ্ধি পাবে মাত্র।

সামরিক বা নৈতিক কোন দিক দিয়েই যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে লুডেনডর্ফের কোন আপত্তি ছিল না। তাঁর মতে "সার্বিক যুদ্ধের প্রয়োজনে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, অবাধ সাবমেরিণ-আক্রমণ সীমাবদ্ধ করবার কোন প্রশ্নই তখন উঠবে না। জলে সাবমেরিণ এবং আকাশে থেকে বিমান প্রতিপক্ষের বন্দরগামী যে কোনো জাহাজের ওপর আক্রমণ চালাবে; এমন কি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পতাকা থাকলেও কোন জাহাজ রেহাই পাবে না। বেসামরিক অধিবাসীদের ওপরও বোমারু বিমানগুলো নির্মমভাবে আক্রমণ চালাবে।"

সর্বপ্রকার সমরোদ্যমকেই লুডেনডর্ফ অভিনন্দিত করেছেন, কিন্তু তার পরিণতি কোথায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে তিনি কিছু বলেননি। তবে একটি

বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কথা বলেছেন, "প্রধান সেনাপতি রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ দেবেন এবং তাঁরা তদনুসারে সামরিক ব্যাপার নির্বাহের জন্যে কর্তব্য সম্পাদন করবেন।" অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে লুডেনডর্ফ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সামরিক ডিক্টেটরতন্ত্রের পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের রূপ, জার্মাণ জাতির প্রাধান্য, রক্তের পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ে লুডেনডর্ফ ও হিটলারের মধ্যে মতবাদ ও চিন্তাধারায় যথেষ্ট মিল রয়েছে ; সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্যেও হিটলার লুডেনডর্ফের কাছেই ঋণী ; কিন্তু সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে হিটলারের নিজস্ব নীতি আছে। এছাড়া সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একই ব্যক্তিতে অর্পিত হওয়ায় অর্থাৎ হিটলার যে পরিকল্পনা করবেন তা কার্যে পরিণত করবার ক্ষমতাও তাঁরই হাতে থাকায় সামরিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে যে বিরোধ দেখা দেবার সম্ভাবনা তাও তিরোহিত হয়। এজন্যেই "গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজি" বা যুদ্ধের চরম নীতি নির্ধারণে হিটলারের বেগ পেতে হয় কম।

হিটলারের স্ট্র্যাটেজি

আরবের লরেন্স এক সময় বলেছিলেন যে, একমাত্র লেনিনের জীবনেই দেখা যায় যিনি বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, তাকে রূপ দিয়েছিলেন এবং অবশেষে বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন।

লেনিনের সঙ্গে হিটলারের আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও হিটলার সম্বন্ধেও এ উক্তি করা চলে। হিটলার আরো একটু অগ্রসর হয়েছেন। বিপ্লবের পূর্বেই তিনি তাঁর ভাবী কর্মপদ্ধতি 'মাইন কাম্প'এ লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিটলার ভিন্নধর্মী হ'লেও সমরনীতিতে

তিনি বলশেভিক বিপ্লবের নীতি ও কৌশলগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করেছেন।

লেনিন বলতেন,—

"The soundest strategy in war is to postpone operations until the moral disintegration of the enemy renders the delivery of the mortal blow both possible and easy."

অর্থাৎ—যুদ্ধের নিখুঁৎ স্ট্র্যাটেজিই হ'ল এই যে, শত্রুর নৈতিক ঐক্য ও দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যতক্ষণ না তাকে মারাত্মক ঘা দেবার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করা।

হিটলারের উক্তিতেও এর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—

"Our real wars will in fact all be fought before military operations begin".

অর্থাৎ—সামরিক অভিযান আরম্ভ হবার আগেই আমাদের যথার্থ যুদ্ধ হয়ে যাবে।

হিটলার আরো বলেন,—

"How to achieve the moral breakdown of the enemy before the war has started—that is the problem that interests me. Whoever has experienced war at the front will want to refrain from all avoidable bloodshed."

অর্থাৎ—যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে কিভাবে শত্রুর নৈতিক দৃঢ়তা বিনষ্ট করা যায় একথাই আমি বিশেষভাবে ভাবি। রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁদের প্রত্যেকেই অনাবশ্যক রক্তক্ষয় এড়াবার চেষ্টা করবেন।

অতএব যাঁদের ধারণা যে হিটলার সমরপরিচালনায় লোকক্ষয়ের প্রতি দৃকপাত করেন না—তাঁরা ওপরে উদ্ধৃত উক্তি হতে সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে সামরিক বলপ্রয়োগে হিটলার কতখানি মিতব্যয়ী। রুশ রণাঙ্গনে বিপুল লোকক্ষয় দেখে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, হিটলার নিছক বিজয়গৌরব অর্জনের জন্যে স্বপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে এরূপ নরমেধ যজ্ঞ করেছেন। সোভিয়েটতন্ত্র ও নাৎসী-তন্ত্রের মধ্যে মৌলিক বিরোধ বর্তমান; সুতরাং ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট শক্তি হিটলারের ভয়ের কারণ এবং সেজন্যেই তাঁর 'রুশিয়া অভিযান'। এই অভিযানে তাঁকে সমকক্ষ সামরিক শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অভিযানে সামরিক বল ছাড়া নানা কৌশলে তিনি যেমন প্রতি-পক্ষের নৈতিক দৃঢ়তা বিনাশে সক্ষম হন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তর বিশৃংখলা সৃষ্টির তেমন সুযোগ তিনি পাননি। অদ্যাবধি অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায় কোন বিভীষণ বাহিনীর অস্তিত্বের কথা শোনা যায়নি। সোভিয়েট এলাকায় হিটলারের বাহিনীকে প্রতিপাদ ভূমি যুদ্ধ ক'রে দখল করতে হয়েছে। সামরিক বলে সমকক্ষ এবং নৈতিক বলে সুদৃঢ় সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এজন্যেই হিটলারকে এত বেশী সৈন্য ও সমরোপকরণ হারাতে হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে হিটলারের সামরিক শক্তি অকস্মাৎ নিঃশেষ হয়ে আসবে এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তিনি একে একে য়ুরোপের দেশগুলো গ্রাস করেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সেই সব দেশ তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য। কতকগুলো দেশ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ সেনাসাহায্য পান আর কতকগুলো দেশ থেকে তিনি সম্পদ ও শ্রমিক সংগ্রহ করেন। বিজিত দেশসমূহে সৈন্যদল গঠনে এবং তাদের রণক্ষেত্রে প্রেরণে অসুবিধে ও আশঙ্কার কারণ আছে; কিন্তু সাধারণ শ্রমিকের কাজে তাদের নিয়োগ করতে তেমন কোন ভয় বা আশঙ্কার কারণ নেই। আধুনিক 'টোটালি-

টারিয়ান ওয়র’ বা সার্বিক যুদ্ধে শ্রমিকের প্রয়োজন কত বেশী কারো অবিদিত নেই। রণাঙ্গনে একজন সৈন্য প্রেরণ করতে হ’লে তার পশ্চাতে নেহাৎ কম পক্ষে পাঁচজন শ্রমিক নিয়োগ করা দরকার। অর্থাৎ প্রতি যোদ্ধায় পাঁচজন শ্রমিক প্রয়োজন। যুদ্ধে দশ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করতে হ’লে তাদের অস্ত্রনির্মাণ ও রসদসরবরাহের জন্যে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। সুতরাং বিজিত দেশসমূহে শ্রমিক সংগ্রহ ক’রে হিটলার বেশী সংখ্যায় জার্মানদের যুদ্ধে পাঠাতে সক্ষম হন। এই কারণেই হিটলারের যোদ্ধসংখ্যা বহুলাংশে বেড়ে যায় এবং রুশ রণাঙ্গনে অপরিমেয় ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁর শক্তির উৎস নিঃশেষ হয়ে আসেনি। যুদ্ধের প্রথম পর্বে স্বল্পমূল্যে এই যে শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষেত্র তিনি আয়ত্ত করেন এখানেই তাঁর স্ট্র্যাটেজির সাফল্য। তাঁর প্রতিপক্ষ তখন সামরিক চালে ঠকে গিয়েছিল; যাকে ইংরেজীতে বলে, “missing the bus”.

পররাষ্ট্র আক্রমণের মূলে অনেকগুলো কারণ থাকে; তবে সবগুলোকে একত্র করলে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য দাঁড়ায় এই যে, প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের ওপর বলপূর্বক স্বরাষ্ট্রের নীতি চাপানো। মানুষের ইচ্ছাই শক্তির মূল উৎস। অপরের ওপর নিজের নীতি চাপাবার সহজতম পন্থা হ’ল তার ইচ্ছাশক্তিকে জয় করা। এই সত্যকে স্বীকার করলেই আর রক্তারক্তিকে যুদ্ধজয়ের একমাত্র পথ বলে ধরা চলে না; যুদ্ধজয়ের অস্ত্র হিসেবে অর্থনৈতিক চাপ, প্রচারকার্য, কূটনৈতিক চাল প্রভৃতির প্রয়োজনও অবশ্য স্বীকার করতে হয়। মাত্র একটি বিষয়ের ওপর জোর না দিয়ে সবগুলো একত্রে প্রয়োগের দ্বারাই অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশী। সমস্ত ক্ষেত্রে সবগুলো উপায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে; যেখানে যেটি প্রয়োগের দ্বারা বেশী ফললাভের সম্ভাবনা সেখানে সেটিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ এমনভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে যাতে স্বল্পতম মূল্যে প্রতিপক্ষের ইচ্ছাশক্তিকে বশ করা যায়। যুদ্ধান্তে তাতে ফল ভালো হয়। কোন যুদ্ধে

চূড়ান্ত জয়লাভ করতে গিয়ে যদি কোন জাতি অপরিমিত রক্তক্ষয়ের দরুণ অসার হয়ে পড়ে তবে তার পক্ষে সেই যুদ্ধজয়ের মূল্য অতি কমই থাকে। বৃটিশ সমর-বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট বলেন,—

"Strategy should seek to penetrate a joint in the harness of the opposing forces. To apply one's strength where the opponent is strong weakens oneself disproportionately to the effect attained. To strike with strong effect, one must strike at weakness."

অর্থাৎ—স্ট্র্যাটেজি নিরূপণে লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে প্রতিপক্ষের বাহিনীর সংযোগস্থলে প্রবেশ ক'রে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রতিপক্ষের সবল স্থানে ঘা দিয়ে ফললাভ করতে হ'লে নিজেরও যথেষ্ট ঘা খেয়ে দুর্বল হতে হয়। আঘাত ক'রে সর্বাপেক্ষা ভালো ফললাভের উপায় হ'ল প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানে ঘা দেওয়া।

অতএব দেখা যায়, তুমুল যুদ্ধের দ্বারা প্রতিপক্ষের ধ্বংসসাধন অপেক্ষা তাকে নিরস্ত্র করাই বেশী লাভজনক। তাতে নিজের ক্ষতি কম এবং জয়-লাভের ফল অপেক্ষাকৃত শুভ হয়। কেবল রক্তাক্ত পথে বিজয়লাভের চেষ্টা করলে শক্তিক্ষয়ের দরুণ স্বপক্ষের অসারতা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে যে-কোন সুযোগ হারালে ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। শত্রুনিধনের চেয়ে কিভাবে শত্রুকে শক্তিহীন ক'রে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যায়, স্ট্র্যাটেজিস্টের তাই ভাবা উচিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে অতিশয় সাধারণ কথা হ'ল এই যে, একজন শত্রুকে হত্যা করলে প্রতিপক্ষের কেবল একজন লোকই কমে; কিন্তু একজন শত্রু ভীতিবিহ্বল হ'লে তার দ্বারা বিপক্ষের সৈন্যদলে মহামারীর মত ত্রাস সংক্রামিত হতে পারে। আর একটু বড় ক'রে দেখলে বলা যায়, বিপক্ষের সেনাপতির মনে কোনরূপ দ্বিধা বা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারলে তদ্দ্বারা এমনও হতে পারে যে তাঁর সৈন্যদলের সমস্ত সমরোদ্যমই

নষ্ট হয়ে গেল। আরো একটু বড় ক'রে দেখলে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, কোনো একটি দেশের গবর্ণমেণ্টের মনোভাবকে যদি নৈতিক চাপে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা যায় তবে এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে, সেই গবর্ণমেণ্ট তার সমস্ত সমরায়োজনই বাতিল করে দেবে—অবশ হাত থেকে তরবারি খসে পড়ার মতো তার সমরোদ্যম কোথায় মিলিয়ে যাবে।

কোন দেশের শক্তি নিরূপণে যে তার জনবল ও সঙ্গতিই সর্বাগ্রে ধর্তব্য তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ দুএর সমন্বয়ে যে সমর-সামর্থ্য গড়ে ওঠে তার মূল ভিত্তি আভ্যন্তর শৃংখলা ও দেশবাসীর মনোবল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নৈতিক দৃঢ়তা ও সরবরাহপ্রণালীই সামরিক দেহের প্রাণকেন্দ্রে শক্তিসঞ্চার করে। শিলাবৃষ্টি হ'লে শিলা কুড়িয়ে আমরা অনেক সময় ডেলা পাকাই। যতই আমরা বাইরে থেকে চাপ দিই ততই তা আরো বেশী শক্ত হয়ে ওঠে এবং তা গলতেও অধিক সময় লাগে। কূটনীতি এবং সমরনীতিতেও একথা খাটে। বাইরে থেকে প্রতিপক্ষকে সরাসরি চাপ দিতে গেলে সাধারণতই সে বেশী দৃঢ় হয়ে বসে এবং শক্তি-সংহতির ফলে তার প্রতিরোধ-ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। অতএব কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মানসিক ও দৈহিক শক্তির সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে তাকে পরাভূত করবার প্রকৃষ্ট পন্থা হ'ল বাঁকা পথে আক্রমণ। স্ট্র্যাটেজির মূল লক্ষ্য যথাসম্ভব প্রতিপক্ষের প্রতিরোধশক্তি হ্রাস করা। তার সঙ্গে আরো বলা দরকার যে, কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে হ'লে একাধিক লক্ষ্যের দিকে নজর দেখাতে হবে; প্রতিপক্ষ যেন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে না পারে যে আসল লক্ষ্য কোন্‌টি। এর দ্বারা কেবল যে প্রতিপক্ষই বিভ্রান্ত হয় এমন নয়, কোনো বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারলে স্বপক্ষের সৈন্যদলে অবসাদ বা পরাজয়ের গ্লানি আসার সম্ভাবনাও তাতে কম।

হিটলার স্ট্র্যাটেজির এই মূল সূত্রগুলোই ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। এই মনস্তাত্ত্বিক স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন ক'রেই তিনি জার্মানীতে রাজনৈতিক

ক্ষমতা লাভ করেন; কখনও পুঁজিবাদী কখনও সমাজতন্ত্রীদের সমর্থক হয়ে তিনি নিজের সুবিধে করে নেন। একবার এদিকে একবার সেদিকে—প্রথম হতেই তিনি এই নীতি অবলম্বন করেন। কা'কেও তিনি বুঝতে দেননি তাঁর আসল লক্ষ্য কোন্ দিকে। এভাবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কর্তৃত্ব হস্তগত ক'রে তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করতে থাকেন। পরের বছরই পূর্ব পার্শ্ব থেকে আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে তিনি পোলাণ্ডের সঙ্গে দশ বছরের মেয়াদে এক শান্তি-চুক্তি করলেন। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর অস্ত্রবল সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হিটলার তা অগ্রাহ্য ক'রে অস্ত্রবল বাড়ালেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বলে তিনি রাইনল্যাণ্ড দখল করলেন। সেবারই তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিম য়ুরোপে বৃটেন ও ফ্রান্সের একটি শত্রু সৃষ্টি করা। ফ্রাঙ্কোর জয়ের দ্বারা তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে বলে তিনি যখন নিশ্চিন্ত হলেন তখন আবার তিনি পূর্বদিকে মুখ ফেরালেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ায় অভিযান চালালেন। ফলে চেকোস্লোভাকিয়ার পার্শ্বদেশ বিপন্ন হ'ল। গত মহাযুদ্ধের পর স্বপ্রভাবিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টি ক'রে ফ্রান্স জার্মানীর চারদিকে যে প্রাচীর খাড়া করেছিল হিটলার কূটনৈতিক চালে তা ভেঙ্গে দিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির দ্বারা তিনি যে কেবল সুদেতেনল্যাণ্ডই ফিরে পেলেন এমন নয়, চেকোস্লোভাকিয়ার মেরুদণ্ড তিনি ভেঙ্গে দিলেন। তারপর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি হৃতবল চেকোস্লোভাকিয়াকে গ্রাস ক'রে পোলাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বদেশে বাহু বিস্তার করলেন। একরূপ বিনা রক্তপাতেই তিনি এতগুলো দেশে তাঁর তথাকথিত 'শান্তি-অভিযান' চালিয়ে মধ্য য়ুরোপে ফরাসী আধিপত্য খর্ব করলেন। কেবল তাই নয়; চারদিকে প্রতিকূল বেষ্টনীকে তিনি অনুকূল ক'রে নিলেন। একেই বলা যায়, রণাঙ্গণে শত্রুকে ঘা দেবার আগে সুবিধেজনক ঘাঁটি

অধিকার করা। এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জার্মানীর অস্ত্রবৃদ্ধির সুবিধে হয় এবং পরোক্ষভাবে তার শত্রুবর্গের শক্তি হ্রাস পায়; কেননা বৃটেন ও ফ্রান্স একে একে তাদের ক্ষুদ্র মিত্রশক্তিগুলোকে হারাতে থাকে। এভাবে হিটলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে এমন অবস্থায় এসে পৌছলেন যে বাইরে থেকে সরাসরি আক্রান্ত হবার ভয় আর তাঁর রইল না। সেই সময় বৃটেন আর একটি চালে ভুল ক'রে বসল। সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়া না ক'রেই সে অকস্মাৎ পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল; অথচ উক্ত দুরাজ্যেই বৃটেন থেকে সামরিক সাহায্য পাঠানো কঠিন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করলে একমাত্র সেখান থেকেই পোলাণ্ড ও রুমানিয়ায় সাহায্যপ্রেরণ সম্ভব হত। কিন্তু তা না ক'রে পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা স্পষ্টত প্রকাশ পেল যে, হিটলার সম্বন্ধে "তোষণনীতি" অনুসরণের অভিপ্রায় আর বৃটেনের নেই। হিটলার তখন তাড়াতাড়ি সামরিক বলে পোলাণ্ড দখল ক'রে পূর্ব দিকে সীমান্ত সম্প্রসারিত করলেন। এরপর আন্তর্জাতিক ঘটনাচক্রের আবর্তন অতি দ্রুত গতিতে চললো।

হিটলারের এই স্ট্র্যাটেজিক সম্প্রসারণের আসল উদ্দেশ্য মঃ স্ট্যালিন বুঝতে পেরেছিলেন। মধ্য য়ুরোপেই হিটলারের সম্প্রসারণচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং তা যে এক ভাবী মহাসমরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মাত্র—একথা পূর্বাহ্নে বুঝতে পেরেই মঃ স্ট্যালিন সেই ভাবী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং তদুদ্দেশ্যেই তিনিও পশ্চিম দিকে সীমান্ত রেখা সরিয়ে দিলেন। হিটলার তাঁর চক্ষে ধুলি দিতে পারেন নি। মঃ স্ট্যালিন তখন পশ্চিম দিকে সোভিয়েট এলাকা না বাড়ালে আক্রমণের প্রথম চোটেই হিটলারের বাহিনী গিয়ে যে লেলিনগ্রাড ও মস্কোতে উপনীত হত, একথা এখন স্ট্যালিনের পরম শত্রুও স্বীকার করছে।

সোভিয়েট ভূমিতে অভিযানের আগে হিটলার বৃটেনের মৈত্রী লাভের আশায় তাঁর অন্তরঙ্গ হের হেসকে বৃটেনে পাঠিয়ে আর এক চাল চেলেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হের হেস অত্যন্ত সোভিয়েট-বিদ্বেষী একথা বৃটেনের শাসকগণ জানেন; কাজেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযান চালাবার জন্যে হেস হয়ত বৃটিশ শাসকগণের মৈত্রী লাভে সমর্থ হবেন। হের হেসকে নিয়ে বৃটেনে তখন নানারূপ জল্পনাকল্পনাও চলে। এমন কি কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রশংসাও করা হয়। Pat Sloan তাঁর Russia Resists নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

"It appears that Hess might have been openly welcome in official circles if the masses of the people had not reacted very strongly against this pro-Hess propaganda, and thus forced a change of tone."

অর্থাৎ—এরূপ হেস-সমর্থক প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র অসন্তোষ জানিয়ে সুর পরিবর্তনে বাধ্য না করলে মনে হয় সরকারী মহলে হেস হয়ত প্রকাশ্যেই সংবর্ধনা পেতেন।

যে কারণেই হোক, হিটলারের সেই চাল ব্যর্থ হয়। মিঃ চার্চিল তখন বেতারে ঘোষণা করেন,—

"Any man or State who fights against Nazidom will have our aid......We shall give whatever help we can to Russia."

অর্থাৎ—যে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নাৎসীশাসনের বিরুদ্ধে লড়বে সেই আমাদের সাহায্য পাবে।...আমরা যতদূর পারি রুশিয়াকে সাহায্য করব।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সামরিক চুক্তির আলোচনায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নানারূপ টালবাহনা ক'রে বৃটেন যে ভুল করেছিল, হিটলারের এই চালে সে আর সেই ভুল করল না। হিটলারকে অগত্যা পশ্চাতে শত্রু রেখেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অভিযান চালাতে হ'ল। স্ট্যালিনের স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে হিটলারের স্ট্র্যাটেজির প্রতিযোগিতা চললো।

যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক দিক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমরনীতি ও রাজনীতি যেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে এর আগে আর কোনো যুদ্ধে তেমন হয়নি। সমরনীতি ও রাজনীতির এই অপূর্ব সমন্বয়ে আধুনিক যুদ্ধ এক নতুন রূপ নিয়েছে। বিখ্যাত সমরবিশারদ ম্যাক্স ভার্ণার বলেছেন,—

"Modern warfare has not only been 'mechanized'; it has also become 'politicalized' and 'psychologicalized." (Battle for the World—Page 233).

অর্থাৎ—আধুনিক যুদ্ধে কেবল যন্ত্রসজ্জাই হয়নি, তার রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও বেড়েছে।

সমরনীতির উন্নতির ফলে যেমন কূটনৈতিক চাল চালতে বেশী সুবিধে হয়েছে, তেমনি কূটনৈতিক যুদ্ধের ফলে সমরনীতিও অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে। যুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র দু'ভাবে প্রয়োগ করা চলে—কূটনৈতিক চাল চেলে এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে। সার্বিক যুদ্ধের যুগে অনেক ক্ষেত্রে সমরাস্ত্র-প্রয়োগ অপেক্ষা কূটনৈতিক চাল চেলেই বেশী ফল পাওয়া যেতে পারে। কূটনৈতিক চালে ভুল করলে মিত্ররাষ্ট্র শত্রুরাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে; আবার কূটনৈতিক চালের জোরেই অপর রাষ্ট্র মিত্রশক্তিতে পরিণত হতে পারে। ক্রমাগত রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে শত্রুর মনোবল নষ্ট ক'রে দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের মনোবল বৃদ্ধি করাও চলে। সার্বিক যুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধেও রাজনৈতিক যুদ্ধের ক্ষেত্র এতটা প্রশস্ত ছিল না। তখন যুদ্ধব্যাপারে রাজনীতির যেটুকু প্রয়োজন ছিল তা এই: যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিরূপণ, কূটনৈতিক কার্যপরিচালনা এবং

রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ। সর্বসাধারণের জন্যে রাজনৈতিক অস্ত্র তেমনভাবে প্রযুক্ত হ'ত না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়িয়েছে। আজকাল স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সৈন্যদল, স্বদেশবাসী এবং শত্রুরাজ্যের অধিবাসী, রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিক এবং রণাঙ্গনের পশ্চাতে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক সকলেরই রাজনৈতিক যুদ্ধের কবলে পড়তে হয়। স্বপক্ষের সৈন্যদলের মনোবল ও রণশক্তি যেমন বৃদ্ধি করা দরকার তেমন স্বদেশবাসীর প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি করাও একান্ত আবশ্যক। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করবার দিকে যেমন নজর থাকে তেমনি যুদ্ধের যারা রসদ যোগায় তাদের নিরুদ্যম করবার জন্যেও নানাভাবে চেষ্টা চলে। বলা বাহুল্য, এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান অস্ত্র রাজনৈতিক প্রচারকার্য। রাজনৈতিক যোদ্ধাদের প্রধান কারবার হ'ল সর্বসাধারণের মনস্তত্ত্ব নিয়ে। সমরনীতি, কূটনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে যারা বেশী সমন্বয় ঘটাতে পারবে এযুগে তাদেরই শক্তি বেশী হবে। য়ুরোপে হিটলার যে প্রথম দিকে অসামান্য সাফল্য লাভ করেন তার মূলে ছিল এই সমন্বয়। হিটলার এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে কিভাবে তাঁর সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গড়ে তুলেছিলেন এখানে সংক্ষেপে তাই আলোচনা করব।

হিটলারের স্ট্র্যাটেজি বুঝতে হ'লে জার্মানীতে কি ভাবে তিনি ক্ষমতা লাভ করেন এবং সমগ্র জাতিকে কি উপায়ে তিনি রণোন্মাদ ক'রে তোলেন তার ইতিহাস খানিকটা আলোচনা করতে হয়। সমগ্র জার্মান জাতিকে তিনি রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে যাদুকরের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলেন। মানুষের মধ্যে আত্মরক্ষার যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে হিটলার সেই প্রবৃত্তিকে বারংবার ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলে কি ভাবে তা বিকারের পথে নিয়ে যান তাই আমাদের জানা দরকার। আচরণতত্ত্বে Conditioned reflex অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট প্রতিভাস' ব'লে একটা কথা আছে। মানুষকে একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যে রেখে তাকে বারংবার একই কথা

শোনালে বা তার চোখের সামনে একই দৃশ্য উপস্থিত করলে একই কথা শুনে শুনে এবং একই দৃশ্য দেখে দেখে সে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সেই বিশেষ ধ্বনি কানে যাওয়ামাত্রই বা সেই বিশেষ দৃশ্য চোখে পড়ামাত্রই তার স্নায়ুমণ্ডলী এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে, বিচারবুদ্ধি হারিয়ে সেটাকেই সে তখন একমাত্র সত্য ব'লে মনে করে এবং তদনুযায়ী যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ সে কাজ ক'রে যায়। হিটলারী নীতির পশ্চাতে যে কোটি কোটি লোকের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় তাও এ-ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম অবস্থায় হিটলারের এত সমর্থক ছিল না। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিটলার জার্মান জাতিকে কতকগুলো স্লোগানে ভুলিয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই দূরদৃষ্টি যাঁদের ছিল জার্মানীতে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কোনো দেশেই অবশ্য খুব বেশী থাকে না; কিন্তু তাঁদের সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার ওপরই একটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন দেশেরও অধিকাংশ লোকই রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণতই নিষ্ক্রিয় থাকে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে মুষ্টিমেয় সচেতন ও সক্রিয় লোকই তাদের পরিচালিত করে। হিটলার দেখলেন যে, তাঁর ক্ষমতালাভের পথে প্রধান অন্তরায় জার্মানীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা; কাজেই তিনি তাঁদের এড়িয়ে গেলেন জার্মানীর কোটি কোটি অধিবাসীর কাছে যারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এজন্যেই নাৎসী জার্মানীতে মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এত নির্যাতন; কেননা হিটলার কতকগুলো স্লোগান দিয়ে জার্মান জাতিকে যেভাবে ক্ষেপিয়ে তোলেন তা ব্যর্থ করবার ক্ষমতা ছিল চিন্তাশীল ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের। হিটলারের মিথ্যা স্লোগানের অন্তঃসারহীনতা একমাত্র যুক্তি দিয়ে তাঁরাই প্রমাণ করতে পারতেন। হিটলার সেজন্যেই জার্মানীর বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নির্বাসনে পাঠিয়ে, বন্দিশালায় আটক রেখে এবং প্রয়োজন হ'লে তাঁদের হত্যা ক'রে নিজের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে নেন

এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে একটা যন্ত্রে পরিণত ক'রে যুদ্ধমুখীন ক'রে তোলেন।

জার্মান জাতির মধ্যে যুদ্ধস্পৃহা জাগাবার জন্যে হিটলার দু'ধরণের অস্ত্র প্রয়োগ করেন—রাজনৈতিক প্রচারকার্য এবং নাৎসীদলের প্রতীক। প্রচারকার্য চালাবার জন্যে তিনি সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও বেতার এই তিনটিকে প্রধান বাহন করেন, আর জনসাধারণকে প্রতীকের সাহায্যে নাৎসীদলের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে তিনি স্বস্তিক ও নাৎসী ইউনিফর্মএর প্রবর্তন করেন। হিটলার জানতেন যে, ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে জার্মান জাতির মনে একটা অসন্তোষের ভাব আছে। কাজেই তিনি প্রথমেই প্রচারকার্য চালালেন যে, ভার্সাই সন্ধির কবল থেকে সমগ্র জার্মান জাতিকে মুক্ত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি বারংবার বলতে লাগলেন যে, ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা জার্মান জাতির উত্থান রোধ করবার জন্যে চারদিকে কারাপ্রাচীরের ন্যায় সব তাঁবেদার রাষ্ট্র দাঁড় করিয়েছে; সেই কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে হিটলার জার্মান জাতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবেন। হিটলার তাঁর আত্মচরিত "মাইন কাম্প"এ এই কথাটাই বার বার বলেছেন। অবশ্য ভার্সাই সন্ধির দ্বারা গত যুদ্ধের বিজেতারা জার্মানীর প্রতি যে খুব সুবিচার করেছিলেন এমন নয়; কিন্তু হিটলার তাঁর সুযোগ নিয়ে যেভাবে সমগ্র জার্মান জাতির মুক্তিদাতা সেজে বসলেন তাতেই ঘটলো যত বিপদ। ভার্সাই সন্ধির রদবদল হওয়া জার্মান জাতির পক্ষে হয়তো প্রয়োজন ছিল; কিন্তু হিটলার তার রদবদলের জন্যে যে পন্থা জার্মান জাতিকে দেখালেন সেই পন্থা ছাড়াও অন্য পন্থা ছিল কিনা সেটাই আজ বিচার্য বিষয়। ভার্সাই সন্ধির অনুদার ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে জার্মান জাতির মধ্যে যে ইচ্ছা চাপা অবস্থায় ছিল জার্মানীর তৎকালীন সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়ায়ই হিটলার তাঁর প্রচারকার্য চালাবার সুবিধে পেয়ে যান। অতএব

ভার্সাই সন্ধির পরিবর্তনকামনা জার্মান জাতির পক্ষে ন্যায় কি অন্যায় হয়েছিল তা বিচার না ক'রেও আজ একথা বলা চলে যে, জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি যদি জার্মান জাতির মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বাস্তববোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সক্রিয়ভাবে জার্মান জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হ'ত তবে হিটলারের নাৎসীদল হয়তো এভাবে উত্থানের সুযোগ পেত না; কিন্তু হিটলার জনসাধারণের মনোভাবকে সেদিন নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে কাজে লাগাতে যতটা সচেষ্ট ছিলেন, জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ততটা সচেষ্ট ছিল না। কেবল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিই নয়, জার্মানীর অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও তখন নাৎসীদলের অভ্যুত্থানকে ঠেকাবার জন্যে তেমনভাবে সক্রিয়তার পরিচয় দেয়নি; অর্থাৎ নাৎসীরা যতখানি aggressive হয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়েছিল জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাট বা কম্যুনিস্টগণ তাদের প্রচারকার্যে তখন ততটা aggressive না হবার ফলেই নাৎসীগণ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকের সংখ্যা হ্রাস পায়। আগেই বলেছি, দেশে রাজনৈতিক ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির তুলনায় সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা থাকে অনেক কম। হিটলারের অভ্যুত্থানকালে হিসাব দৃষ্টে দেখা যায়, জার্মানীতে রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা দশজনের বেশী ছিল কিনা সন্দেহ; বাকী নব্বই জনই ছিল নিষ্ক্রিয়। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ১৯৩২ সালে জার্মানীর অন্তর্গত হাইডেলবার্গে যতগুলি রাজনৈতিক সভা হয় তাতে কোন্ দলের সভায় কতলোক উপস্থিত হয়েছিল তার বিবরণই এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করব; কেননা পরবর্তীকালে জার্মানীর অধিকাংশ স্থানে রাজনৈতিক সভাগুলোতে লোকের উপস্থিতির এরূপ অনুপাত পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩২ সালে হাইডেলবার্গ সহরে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। জার্মানীর তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভাগুলোতে ছশ' থেকে আটশ'এর মতো লোক সাধারণত উপস্থিত হত; দুহাজারের ওপরে কখনই উঠত না। নাৎসী দলের সভাগুলোতে প্রায় অনুরূপ সংখ্যক লোকই উপস্থিত হ'ত। ক্যাথলিক সেণ্টার, কম্যুনিস্ট, লিবারেল প্রভৃতি বাকী রাজনৈতিক দলগুলোর সভায় সবশুদ্ধ হাজার খানেকের বেশী লোক উপস্থিত হ'ত না। মোট হাজার পাঁচেক লোক ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক সভাগুলোতে যোগ দিত। অতএব দেখা যায়, হাইডেলবার্গের মোট ৬০ হাজার ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ৫ হাজার ছিল রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয়; বাকী ৫৫ হাজার ভোটদাতাই ছিল নিষ্ক্রিয়। অথচ ভোটের সময় এই ৫ হাজার সক্রিয় ভোটদাতার ওপর নির্ভর ক'রে কারো নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ৫ হাজার সক্রিয় ভোট দাতার চেয়ে ৫৫ হাজার নিষ্ক্রিয় ভোটদাতার ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশী; কারণ তাদের সমর্থন অসমর্থন দ্বারাই নির্বাচনে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। অতএব কেউ নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাইলে এই সক্রিয় ৫ হাজার ভোটদাতার দ্বারস্থ না হয়েও ৫৫ হাজার নিষ্ক্রিয় ভোটদাতার মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে অনায়াসে নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য, হিটলার তাঁর রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাবার জন্যে এই ৫৫ হাজার নিষ্ক্রিয় ভোটদাতাকেই বেছে নেন, কারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ভোটদাতাদের কাছে যে নির্বিচার সমর্থন পাওয়া যাবে না একথা তিনি জানতেন। রাজনৈতিক আদর্শ পৃথক হ'লেও প্রচারকার্য চালনায় হিটলার কিন্তু লেনিনকে অনুসরণ করেছেন। হিটলার কেবল তাঁর কৌশলটাই আয়ত্ত করেছেন, লেনিনের রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করেননি। লেনিন বলতেন:—

"The revolutionary propagandist must think in terms of hundreds, the agitator in terms of tens of thousands, and the organizer and leader of the revolution in terms of millions!"

অর্থাৎ—বিপ্লবী প্রচারককে শ'শ' লোকের কথা ভাবতে হবে, আন্দোলনকারীকে হাজার হাজার লোকের কথা ভাবতে হবে এবং সংগঠক ও বিপ্লবের নায়ককে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা ভাবতে হবে।

হিটলারও তাঁর 'মাইন কাম্প'এ লিখেছেন :—

"The task of propaganda is to attract followers that of organization to enroll partisans and affiliated members of the party."

অর্থাৎ—প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য হ'ল দলের সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, দল যাতে ভারী হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা।

এই দলপুষ্টির জন্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে যারা নিষ্ক্রিয় তাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোই সর্বাপেক্ষা সুবিধেজনক। আরো সুবিধে হয় যদি শিশুদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো যায়। শিশুদের কাঁচা মন সহজেই গড়ে নেওয়া সম্ভব ; বিশেষত জাঁকজমকের দিকে তাদের মন আকৃষ্ট হয় সহজে। এজন্যে খেলাধুলা, গানবাজনা ও সিনেমার সাহায্যে নাৎসীরা জার্মানীর নাবালক সমাজকে আকৃষ্ট করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। শিশুদের মধ্যে অভিপ্রেত conditioned reflex-এর সৃষ্টি করা যত সহজ, বয়স্কদের মধ্যে তা করা তত সহজ নয়। সেজন্যেই নাৎসীদলে যারা যোগদান করতে অসম্মত হ'ত তাদের শাসিয়ে হিটলার বলতেন :—

"If you do not join our ranks, so be it, but we shall get your children."

অর্থাৎ—তোমরা আমাদের দলে আসবে না? বেশ, নাই বা এলে। কিন্তু তোমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা পাবই।

শিশুমনে নাৎসী প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের এমনভাবে হিটলারভক্ত ক'রে তোলা হয় যে, তারা বড় হয়ে বলতে আরম্ভ করে "আমরা হিটলারের জন্যে মরব, জার্মানীর জন্যে, ফুরারের জন্যে মরতেই আমরা জন্মেছি।"

হিটলার-গঠিত জার্মানীর যুবসমাজের এই স্লোগানেও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে—জার্মানী ও হিটলার তাদের কাছে এক হয়ে উঠেছে; ফাসিস্ত ডিক্টেটরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে, রাষ্ট্র ও ডিক্টেটর সেখানে অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য—অর্থাৎ রাষ্ট্রই ডিক্টেটর এবং ডিক্টেটরই রাষ্ট্র। এ থেকেই ফাসিস্ত ডিক্টেটরের ওপর একটা অতিমানবত্ব আরোপিত হয়।

হিটলার ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে জার্মানীর জনসাধারণকে নাৎসীদলে টানবার চেষ্টা করলেও তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল জার্মানীর পুঁজিপতিদের হাত করা। সেজন্যেই তিনি বলশেভিকবাদের আগাগোড়া মুণ্ডপাত করেছেন এবং জার্মান কম্যুনিস্টরা যে দেশের শত্রু একথা জোর গলায় প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, কম্যুনিস্টদের নিন্দাবাদ করলেও সোস্যালিজম্-এর অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদের গন্ধটাকে কিন্তু তিনি প্রথমে ছাড়েননি। সেজন্যেই তিনি দলের নাম রেখেছিলেন—ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব খর্ব করা এবং জার্মান শ্রমিকদের ধাপ্পা দেবার জন্যেই তিনি দলের নামের মধ্যে সোস্যালিজম-এর গন্ধটুকু রেখেছিলেন। তাঁর প্রচারকার্যে জার্মানীর শ্রমিকরা কিরূপ বিভ্রান্ত হয়েছিল W. Munzenberg তাঁর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের যে-সকল শ্রমিক দলত্যাগ ক'রে হিটলারের ঝটিকা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, ১৯:২ খৃষ্টাব্দে তাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়ঃ—

"We have not changed. But among you Socialists everything is too slow-going. Adolf is working more rapidly. And if he betrays us he will be hanged by us."

অর্থাৎ—আমাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তোমরা সোস্যালিস্টরা বড় আস্তে আস্তে চল। অ্যাডল্ফ্ (হিটলার) অনেক বেশী তাড়াতাড়ি

কাজ করেন। তিনি যদি কখনও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন আমরা তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো।

বলা বাহুল্য, হিটলারকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়নি; একদিন যারা একথা বলেছিল উত্তরকালে তাদেরই অনেককে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল। হিটলারের সমাজতান্ত্রিক স্লোগানে বিশ্বাস ক'রে যে-সব সমাজতান্ত্রিক নেতা নাৎসী দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং হিটলারের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁদের অনেকেরই রক্তে হিটলার জার্মানীর ভূমি রঞ্জিত করেন। হিটলারের সোস্যালিস্ট স্লোগানেরও সেখানেই শেষ।

হিটলার যে-প্রচারকার্য চালিয়ে জার্মানীতে ক্ষমতা লাভ করেন, উত্তর-কালে পররাষ্ট্র-অভিযানেও সেই অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তিনি বহুলাংশে সফল হন। অন্য রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন বাহিনীই (Fifth column) সেই রাজনৈতিক প্রচারকার্যের মূর্ত প্রতীক। নাৎসী-অধিকৃত দেশগুলোতে প্রচ্ছন্ন বাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে। অতএব সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে আজ একথা ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে, অস্ত্রবল প্রয়োগ না ক'রেও প্রচারকার্যের জোরেই কোন একটা জাতির মনোরাজ্যে কিরূপ বিপ্লব ঘটানো চলে। বিদেশী শক্তিসমূহের পরস্পর-বিরোধী প্রচারকার্য থেকে আমরাও আজ মুক্ত নই। কাজেই আমাদের জাতীয় জীবনে যাতে চিত্তবিকার না ঘটে সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। নাৎসী জার্মানীর অসাধারণ শক্তি দেখে আমাদের দেশে একদিন হয়তো অনেকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু সেদিন নাৎসী শক্তির বাহ্যিক আড়ম্বর যতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল তার অন্তর্নিহিত ধ্বংসের বীজ ততটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। গত মহাযুদ্ধের পর দুশক্তির অভাবনীয় অভ্যুত্থান জগদ্বাসীকে বিস্মিত করে—নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। শক্তি অর্জনের দিক দিয়ে এই দুরাষ্ট্রের মধ্যে বাহ্যত কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হ'লেও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দুরাষ্ট্রের শক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। হিটলার

অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জার্মানীতে প্রচারকার্য চালিয়ে যেভাবে সমগ্র জার্মান জাতির মানসকে এক যান্ত্রিকতায় পরিণত করেন, লেনিন এবং স্ট্যালিন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই প্রচারকার্যেরই সহায়তায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রবাসী-দের মানসকে এক নতুন সভ্যতার পটভূমিতে রূপায়িত করেন। অতএব আজ এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—যে-শক্তি জার্মানীর মতো একটা সুসভ্য জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয় আজ আমরা তারই পূজারী হব—না যে-শক্তি মানব জাতিকে এক নতুন সভ্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় সেই শক্তিতেই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলবার প্রয়াস পাব ?

সামরিক আবর্তন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে বুঝতে হ'লে এর বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা দিয়ে বুঝতে হয়। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ড, নরওয়ে, পশ্চিম য়ুরোপ এবং বল্কানের যুদ্ধগুলো ছিল স্থানীয় যুদ্ধের পর্যায়ে। তারপর জার্মানী ও ইতালী একযোগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালায় তাও বৃটেনের ওপর আকাশযুদ্ধ এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা ও আফ্রিকার যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর জার্মানী যখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করল তখন যুদ্ধ আবার য়ুরোপ মহাদেশের মূলখণ্ডে ফিরে গেল এবং তখনই যুদ্ধটা সত্যিকারের মহাযুদ্ধে পরিণত হ'ল। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় বর্তমান মহাযুদ্ধ বিশ্বসংগ্রামের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, যুদ্ধের প্রথম দিকে যারা মিত্র ছিল পরে তাদের অনেকে শত্রুতে পরিণত হ'ল এবং আগে যারা শত্রু ছিল পরে তাদের অনেকে মিত্র রূপে যোগ দিল।

ফ্রান্সের পতনের পর ভিশি-ফ্রান্স নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল এবং অপরদিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তিতে পর্যবসিত হ'ল।

বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুধ্যমান দেশমাত্রই সার্বিক যুদ্ধের নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধকে কোন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা আর সম্ভব হয়নি। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে যেভাবে যুদ্ধ সুরু হয় তাকে কেবল ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের বৃহত্তর যুদ্ধের ক্ষেত্রপ্রস্তুতি বলা চলে। পোলাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স ও বল্কানের যুদ্ধদ্বারা ঠিক আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়নি; সেগুলোকে কেবল দেশদখলের একতরফা অভিযান বলা চলে। গত মহাযুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম বলতে যা বুঝাতো এ মহাযুদ্ধে তা বোঝায় না। সকল দিক দিয়ে এযুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা গত মহাযুদ্ধকে অতিক্রম করেছে। উপরোক্ত যুদ্ধগুলোতে অস্ত্রবল, রণকৌশল ও সামরিক শক্তিতে দু'পক্ষের মধ্যে এমন তারতম্য ছিল যে যার কোন তুলনাই চলে না; তার ফলে সেই সব ক্ষেত্রে সত্যিকারের যুদ্ধ হয়নি। পোলিশ-অভিযান থেকে সুরু করে বল্কান-অভিযান পর্যন্ত ধরলে দেখা যায়, আক্রমণকারীদের আক্রমণের তুলনায় আত্মরক্ষাকারীদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেক নিকৃষ্ট ছিল; ফলে সেই সব স্থানে যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা আরম্ভ হয় জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধে। সোভিয়েট রণাঙ্গনে উভয় পক্ষ বিপুল সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামে এবং যুদ্ধের রুদ্র রূপ সেখানেই প্রকাশ পায়। তার ফলে সেখানে উভয় পক্ষের গড়পরতা ক্ষতির পরিমাণ গত মহাযুদ্ধের ক্ষতির প্রায় তিন চার গুণে গিয়ে দাঁড়ায়।

জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধকে সোভিয়েট ভূমি দখলের জন্যে কেবল সোভিয়েট জনসাধারণের বিরুদ্ধে আধুনিক জার্মান বাহিনীর যুদ্ধ—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে ভুল করা হবে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট শক্তি তার বিস্তৃত এলাকা

ও একমাত্র জনসাধারণের বীরত্ববলেই এই যুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে এমন মনে করাও ভুল। জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধ হ'ল সত্যিকারের দু' আধুনিক সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ। সম্মিলিত শক্তিবর্গের স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে লাল ফৌজের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রধান বিচার্য বিষয় হ'ল এই যে, লালফৌজ আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত এবং আধুনিক রণকৌশল ও সমরনীতিতে তারা অভ্যস্ত। গত মহাযুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনের যেরূপ গুরুত্ব ছিল, বর্তমান মহাযুদ্ধে সোভিয়েট রণাঙ্গন ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে জার্মান সৈন্যদল ছিল তার তুলনায় হিটলারের জার্মান বাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী এবং এদের আক্রমণের ক্ষমতা অধিক। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানরা গতীয় যুদ্ধ চালাবার যতখানি সুবিধে পেয়েছিল, এবার সোভিয়েট রণাঙ্গনে হিটলারের বাহিনী তদপেক্ষা বেশী সুবিধে পেয়েছে এবং দেশদখলের দিক দিয়েও হিটলার ঢের বেশী লাভবান হয়েছেন। কিন্তু সামরিক বিচারে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধে এক দিকে জার্মান বাহিনী এবং অপর দিকে ফরাসী ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে রণসামর্থ্যে যে আপেক্ষিক সম্পর্ক ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান বাহিনী এবং লালফৌজের মধ্যেও ঠিক সেই আপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধকে বুঝতে হ'লে অন্য যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা না ক'রে তার নিজস্ব ধারা দিয়ে বুঝতে হয়। সেখানে দু' সমকক্ষ শক্তির মধ্যে লড়াই এবং উভয় দেশের সমর-পরিকল্পনাও পৃথক। কাজেই সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মানীর সাফল্য-অসাফল্যের বিচার করতে হ'লে জার্মান রণনীতির মানদণ্ডে ফেলেই তা করতে হয় এবং সোভিয়েট সাফল্য-অসাফল্যকেও সোভিয়েট রণনীতির মানদণ্ডে না ফেলে বিচার করা চলে না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে য়ুক্রেনের যুদ্ধের ফলাফল দেখেই বোঝা গিয়েছিল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জার্মান আক্রমণ কোন্ পথে চালিত হওয়া সম্ভব। স্মোলেনস্কের যুদ্ধের ফলাফল দেখেই বোঝা গিয়েছিল মস্কো-যুদ্ধের পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে। জার্মান বাহিনীর চরম আক্রমণশক্তি কতখানি, সোভিয়েট রণাঙ্গনে

তা প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জার্মান বাহিনী অসীম শক্তিসম্পন্ন নয়; তাদের শক্তিরও একটা সীমা আছে। তাছাড়া জার্মান আক্রমণশক্তি ও সোভিয়েট প্রতিরোধশক্তি কতখানি তারও পরীক্ষা হয়ে গেছে; অর্থাৎ আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জার্মান বাহিনী যে অজেয় নয় এবং প্রতিরোধাত্মক রণনীতিও যে আক্রমণাত্মক রণনীতির সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াতে পারে এটাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি দেখেই অনেকটা অনুমান করা গিয়েছিল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সেখানে যুদ্ধ কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলাফলই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করে। প্রথম বছরে প্রান্তিক যুদ্ধে জার্মান বাহিনী সাফল্য লাভ ক'রে য়ুক্রেনে অনেকখানি এগিয়ে যায়; কিন্তু মস্কো দখল করতে গিয়ে জার্মানরা বিষম ঘা খায়। মস্কো-যুদ্ধের ফলাফল দৃষ্টে বোঝা গিয়েছিল, জার্মান বাহিনী সরাসরি মস্কোদখলের জন্যে আর চেষ্টা না ক'রে পরের বছর য়ুক্রেন থেকে সম্ভবত ককেশাসের দিকে অভিযান চালাবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সত্যিই ককেশাসের দিকে অভিযান চালিয়ে জার্মান বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়; কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাডে তাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। প্রথম বর্ষের তুলনায় দ্বিতীয় বর্ষে জার্মান আক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা হ্রাস পায় এবং প্রথম বর্ষের তুলনায় দ্বিতীয় বর্ষে সোভিয়েট বাহিনীর প্রত্যাক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়। জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; দ্বিতীয় বর্ষের তুলনায় তৃতীয় বর্ষে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা অভাবনীয় রূপে কম এবং সোভিয়েট প্রত্যাক্রমণ অনেক বেশী তীব্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভ এখনও পর্যন্ত না হ'লেও বিভিন্ন শক্তির যুদ্ধের স্বরূপ ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। আধুনিক স্থলযুদ্ধের পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে জার্মান-সোভিয়েট রণাঙ্গনে। সমস্ত বাহিনীর সমবায়ে গতীয়

যুদ্ধ চালিয়ে কিভাবে প্রতিপক্ষের অন্তর্ভেদ ক'রে তাদের পরিবেষ্টন ও নিশ্চিহ্ন করতে হয় সোভিয়েট রণাঙ্গনে তা ভালোভাবে প্রত্যক্ষ হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের গতি এক অপ্রত্যাশিত পথে ধাবিত হয়। সেখানে বড় বড় নৌযুদ্ধ না হ'য়ে নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমবায়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মূল এসিয়ার পূর্বাঞ্চল দখলের অভিযান চলে। এই যুদ্ধে নৌশক্তির গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে বিমানবলের গুরুত্ব বেড়েছে। অবশ্য নৌবলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন মনে করলেও ভুল করা হবে, নৌবল প্রয়োগের ধরণটা কিছু বদলেছে এবং আগের চেয়ে এখন স্থলসেনা ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনীর সহযোগিতার প্রয়োজন বেড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলা যায় যে, কেবল বিমানবল প্রয়োগ ক'রে কোন যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে জয় করা অসম্ভব, বিমানবলেরও স্থলসেনা এবং নৌবলের সঙ্গে সহযোগিতা আবশ্যক। এছাড়া আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, নৌ, বিমান বা স্থলসেনাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ'রে কোন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা চলে না। নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমবায়ে আধুনিক সার্বিক যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নিরূপণ করতে হয়; বিশেষত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই স্ট্র্যাটেজি ধ'রে সংগ্রাম না চালালে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করা কঠিন। জাপান এই স্ট্র্যাটেজি অনুসারে যুদ্ধ চালিয়েই অত্যল্পকালের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নৌবলের সহযোগিতার ওপর ততটা জোর না দিয়েও পারে; কারণ তাদের যুদ্ধ প্রধানত স্থলভাগেই সীমাবদ্ধ। তবে জার্মান ও সোভিয়েট বাহিনীর স্থলযুদ্ধে বিমানবল ও স্থলসেনার ঘনিষ্ঠ সহ-যোগিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

পোলিশ-অভিযান থেকে আরম্ভ ক'রে বল্কান-অভিযান পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মান স্ট্র্যাটেজি অনুসারেই অগ্রসর হয়, একমাত্র বৃটেনের ওপর "লুফৎভাফে" চালাতে গিয়েই তার ব্যতিক্রম ঘটে। জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে যুদ্ধ আর জার্মান পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হয়নি।

স্থলযুদ্ধে জার্মান "ব্লিৎস" সোভিয়েট রণাঙ্গনে এসে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কোনো মহলে ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে, "জেনারেল ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ব্লিৎসক্রীগের পাঁচ বছর নামে একখানি বই লিখছেন।" সোভিয়েট ভূমিতে অভিযান চালাবার ফলে জার্মানীকে এক বিলম্বিত যুদ্ধে প্রবেশ করতে হয়েছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কাজেই যে যুদ্ধ চার বছর অতিক্রম ক'রে পাঁচ বছরে এসে পৌছে সেই যুদ্ধকে আর "ব্লিৎসক্রীগ" বলা চলে না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে জার্মান আক্রমণ এবং অপরদিকে সম্মিলিত শক্তিবর্গের সমবেতভাবে সংগ্রাম চালাবার নীতি নির্ধারণ—এই দুএর মধ্যে একটা পাল্লা চলে, উভয় পক্ষকেই সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। জার্মানী এই ব'লে শঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, ক্রমশ তার সৈন্যদের আক্রমণশক্তি কমে আসছে। সোভিয়েট ভূমিতে অভিযান চালাতে গিয়ে তার মূল সমরপরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তাতে যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ায় জার্মানীর আরো আশঙ্কা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার তেলের অভাব ঘটতে পারে এবং সেজন্যেই সে তখন সোভিয়েট বাহিনীকে সামরিক বলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবার চিন্তা ছেড়ে ককেশাসের তৈলাঞ্চল দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য যে-কোন মূল্য দিতে সে উদ্যত হয়। মিত্রপক্ষের যে কারণে আশঙ্কা হয় তা এই : দক্ষিণ দিকে জার্মানদের অগ্রগতির ফলে সোভিয়েট সরবরাহ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা এবং সমবেতভাবে মিত্রপক্ষের সমর-পরিকল্পনা গ্রহণে বিলম্ব। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গ সামরিক ব্যাপারে এক্সিস শক্তি-বর্গের বিরুদ্ধে সমবেত নীতি অবলম্বনে সক্ষম হয়। অবশ্য ভুল করবার মতো সময়ও তখন তাদের আর ছিল না। যুদ্ধ এসে এমন স্তরে পৌছায় যে প্রাচীন সমরনীতি আঁকড়ে ধ'রে বসে থাকলে, একটু সময় নষ্ট করলে বা সার্বিক যুদ্ধের প্রয়োজন একটু উপেক্ষা করেল মিত্রপক্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠতে পারতো। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সামরিক ও

কূটনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যে সম্মিলিত দল গঠনে পরাঙ্মুখ হয়েছিল, যুদ্ধের আবর্তনে উত্তরকালে চাপে প'ড়ে সেই সম্মিলিত দল গঠন করতে তারা বাধ্য হ'ল। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে-সোভিয়েট শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল সেই সোভিয়েট শক্তিই আজ ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে এককালে পুঁজিতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা যে ভুল করেছিল আজও সেই ভুল তাদের সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গেছে বলে মনে হয় না। ভুল ভাঙ্গলে নিশ্চয়ই তারা সাম্রাজ্যবাদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পরাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণা করত এবং তাতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্যে মিত্রশক্তিবর্গ যুদ্ধ করছে ব'লে যে ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হয়েছে তার সঙ্গতি রক্ষা পেত। কেবল ফাসিস্ত-কবলিত দেশগুলোর পুনরুদ্ধারের কথাই সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের কবলিত দেশগুলোর যে যুদ্ধান্তে কি অবস্থা হবে সেই সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তি নেই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রত্যাক্রমণ চালাবার প্রধান ঘাঁটি আজ ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা আজ একরূপ নীরব। বাংলায় দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিচ্ছায়া আমলাতন্ত্র ঐকান্তিক চেষ্টায় বিরত। আধুনিক সার্বিক যুদ্ধে রণাঙ্গনের পৃষ্ঠদেশে এরূপ বুভুক্ষিত কোটি কোটি নরনারী রাখা যে কিভাবে সমীচীন হতে পারে তা বুদ্ধির অগম্য। কোন স্বাধীন দেশ থেকে যুদ্ধ চালাতে হ'লে সৈন্যদলের রসদ সরবরাহকারী জনসাধারণকে এরূপ দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিতে তথাকার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ইতস্তত বোধ করতেন; কেবল সমরাস্ত্র ও সৈন্যবলের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁরা জাপানের মতো প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ চালাতে যেতেন না; সৈন্যদলের পশ্চাতে সুস্থ, সবল ও সন্তুষ্টচিত্ত জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি যাতে থাকে তার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করতেন। কিন্তু সাম্রাজ্য-

বাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পুঁজিবাদের সমর্থক শাসকগণ আধুনিক সার্বিক যুদ্ধের এই একান্ত প্রয়োজনীয় দিকটা উপেক্ষা করতে চলেছেন। উত্তর আফ্রিকায় বিজয়লাভ, মুসোলিনীর পতন বা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রবাহিনীর সাফল্যের সংবাদ যতই আশাপ্রদ হোক না কেন, বাংলা দেশের ক্ষুৎপীড়িত মুমুর্ষু জনগণের চিত্ত তদ্দ্বারা খুব বেশী আলোড়িত হয়ে উঠবে না। অন্নক্লিষ্ট বাংলার গণচিত্তে যদি ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার যথার্থ প্রেরণা আনতে হয় তবে বাঙ্গালীর মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বৃটিশ শাসকগণ যদি আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে মুক্তি দেন এবং দেশের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ভারতের শাসনভার অর্পণ করেন তবেই এই সমস্যার আশু প্রতিকার হতে পারে। সেইক্ষেত্রে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রাণে যে নববলের সঞ্চার হবে সেই বলের সহায়তা পেয়ে মিত্রপক্ষের বাহিনী অল্পকালের মধ্যে ফাসিস্ত জাপানকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হবে এবং তাতে যুদ্ধ সহজ হয়ে আসবে। এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নিয়েই আজ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রাচ্যযুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নিরূপণ করা উচিত।

বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজি

গত চার বছরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে কিছু বাকী নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলো একে একে সবই যুদ্ধে বিজড়িত হয়ে পড়েছে; কাজেই কোন দেশের সমরনীতি ও রণকৌশল আজ আর গোপন নেই। ইংলণ্ডের ওপর বিমানহানায় আধুনিক বিমানবলের চরম পরীক্ষা হয়ে যায়; কেবল বিমানহানা চালিয়ে কোনো শক্তিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যে সম্ভব নয় তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর সোভিয়েট রণাঙ্গনে আধুনিক সার্বিক যুদ্ধ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ-যুগের যান্ত্রিক যুদ্ধ যে কতখানি প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে সোভিয়েট রণাঙ্গনেই তার প্রথম পরিচয় মেলে। বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স ভার্ণার যথার্থ ই বলেছেন ঃ—

"The real World War, the Great War, began only with the German-Soviet War. The vast extension of the front, the volume of forces engaged, the intensity and duration of the fighting, immediately made of the German-Soviet War the central front of World War II." (The Great Offensive—Page 14)

অর্থাৎ—জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধ বাধবার পরই সত্যিকারের বিশ্বযুদ্ধ, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রণাঙ্গনের বিশাল বিস্তৃতি, বিপুল সামরিক বলের প্রয়োগ, যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও স্থায়িত্ব প্রভৃতির কথা বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহেই বলতে হয় যে, জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধেই দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের প্রধান রণাঙ্গন খোলে।

যথার্থই রণক্ষেত্রের বিস্তৃতি, সৈন্যবল, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সমরনীতি ও রণকৌশল সব দিক দিয়েই সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ আর সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে

যায়। আধুনিক স্থলযুদ্ধের জন্যে এই দু'রাষ্ট্রই প্রস্তুত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই এই দু'শক্তির সংঘর্ষে স্থলযুদ্ধের নীতি ও কৌশল সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে। জার্মান সমরনায়কগণ তাঁদের তূণে যত অস্ত্র ছিল একে একে সব সোভিয়েট রণাঙ্গনে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন, অর্থাৎ সোভিয়েট ভূমিতে অভিযান চালাতে গিয়ে তাঁদের চরম শক্তি নিয়োজিত করতে হয়। পক্ষান্তরে জার্মান বাহিনীর অভিযান থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষেরও সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়তে হয়। ফলে উভয় পক্ষের অস্ত্রবল, সমরনীতি ও রণকৌশল সবই প্রকাশ হয়ে পড়ে। মোটকথা, আধুনিক স্থলযুদ্ধের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ বোঝবার পক্ষে সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আধুনিক নৌযুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে হ'লে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকাতে হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধবার আগেই ম্যাক্স ভার্ণার তাঁর "Battle for the World" বই-এ লিখেছিলেন :—

"There have so far been no large-scale naval war operations. In the nature of the situation these could probably take place only in the Pacific."

অর্থাৎ—এ পর্যন্ত কোন বড় রকমের নৌযুদ্ধ হয়নি। অবস্থা গতিকে মনে হয় একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরেই তা হওয়া সম্ভব।

সত্যিই বর্তমান মহাযুদ্ধে নৌনীতির পরীক্ষা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে ; তবে নৌযুদ্ধের রূপ অনেকটা বদলে গেছে। বড় বড় ব্যাটল্‌শিপ নিয়ে গঠিত নৌস্কোয়াড্রনগুলোর মধ্যে সেখানে সমুদ্রবক্ষে শক্তিপরীক্ষা হয়নি, হয়েছে ভিন্ন ভাবে। কাজেই এতদিন নৌযুদ্ধ সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা ছিল—বিশেষভাবে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে চিরাচরিত নৌনীতির ওপর নির্ভর ক'রে ছিল,—তা ভেঙ্গে গেছে। প্রতিপক্ষের জাহাজ ডোবাবার জন্যে সমুদ্রবক্ষে টহল না দিয়ে জাপানী নৌবহর দেশদখলে জাপানী স্থলসেনাকে সাহায্য

করেছে। অথচ প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌযুদ্ধ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন নৌমহল আগাগোড়া অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ নৌবিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান সংবাদদাতা Vice-Admiral C. V. Usborne তাঁর "Evolution of Sea Power" নামক পুস্তকে লেখেন :—

"Then a fleet greatly superior to that of Japan could be concentrated in the South and so far as anything can be foreseen, where chance plays so great a part, it could move northward, compelling the Japanese either to retire or to face annihilation of their fleet."

অর্থাৎ—জাপানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নৌবহর দক্ষিণ দিকে সমাবেশ করা যাবে এবং যতদূর দেখা যায় সুযোগ পেলে উত্তর দিকে সেই নৌবহর চালিয়ে হয় জাপানীদের হটিয়ে দেওয়া হবে, নয়ত তাদের নৌবহরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান সংবাদদাতা Lieutenant-Commander William D. Pulestonও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর "The Armed Forces of the Pacific" নামক পুস্তকে লেখেন :—

"During these encounters the American Fleet being the stronger, should seek battle on all occasions and in all waters except along the coast of Japan and its overseas bases. It would prefer a major engagement in the early part of the campaign and a chance to end the war at a blow."

অর্থাৎ—যুদ্ধের সময় অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী মার্কিন নৌবহর একমাত্র জাপানের উপকূলবর্তী দরিয়া ও বহির্ভাগস্থ জাপানী

ঘাঁটিগুলোর আশপাশ ছাড়া আর সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে (জাপানী নৌবলের সঙ্গে) যুদ্ধের জন্যে ঘুরে বেড়াবে। যুদ্ধের প্রারম্ভেই মার্কিন নৌবহর বড় রকমের নৌযুদ্ধে জাপানকে হারিয়ে এক ঘায়ে যুদ্ধ শেষ করবার চেষ্টা করবে।

কার্যকালে দেখা গেছে, প্রশান্ত মহাসাগরে যে-ধরণের নৌযুদ্ধ হবে ব'লে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আশা করেছিল সে ধরণের নৌযুদ্ধ সেখানে হয়নি। জাপান তার প্রতিপক্ষের নৌবহর ধ্বংস করবার জন্যে কোথাও নৌবল প্রয়োগ করেনি। বিভিন্ন দ্বীপে ও মূল এসিয়ার পূর্ব খণ্ডে সৈন্য-অবতরণে সে তার নৌবল নিয়োজিত করে এবং সেই পথে মিত্রপক্ষের নৌবল যখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র তখনই সে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের Grand Strategy সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে য়ুরোপের স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে বলতে হয়। য়ুরোপের স্ট্র্যাটেজির কথা তুললে সর্বাগ্রে মনে আসে গোড়ার দিকে মিত্রশক্তিবর্গের coalitionএর অভাব। ভার্সাই সন্ধির পর য়ুরোপের সামরিক প্রাধান্য ক্রমশ পশ্চিম য়ুরোপ ছেড়ে মধ্য ও পূর্ব য়ুরোপে চলে যায়; অর্থাৎ একদিকে জার্মানী ও অপরদিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রবল বাড়াতে থাকে এবং যন্ত্র-সজ্জার ফলে আধুনিক যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রভূত শক্তির কথা জেনেও বৃটেন এবং ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ তার সঙ্গে ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে কুণ্ঠিত হন, এ কথা আগেই বলেছি। তেমন একটা চুক্তি যাতে হতে পারে তার শেষ সুযোগ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মস্কো-আলোচনায় দেন; কিন্তু তখনও বৃটেন এবং ফ্রান্সের কর্ণধারগণ নানা টালবাহনায় তা এড়িয়ে যান। হিটলার সেই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাড়াতাড়ি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ-চুক্তি ক'রে পূর্ব সীমান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। হিটলার বরাবর দু'রণাঙ্গনকে ভয় ক'রে এসেছেন, কারণ পোলাণ্ড-অভিযানের

প্রাক্কাল পর্যন্তও দু'রণাঙ্গনে এক সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার মতো সামর্থ্য তাঁর ছিল না; কিন্তু পশ্চিম য়ুরোপ জয়ের পর তাঁর রণসামর্থ্য অনেক বেড়ে যায় এবং পশ্চিম রণাঙ্গন সম্বন্ধে যখন তিনি নিশ্চিন্ত হন তখন আবার পূর্ব রণাঙ্গনে সমকক্ষ শক্তি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ফাসিস্ত শক্তির সঙ্গে যে একদিন শক্তিপরীক্ষা হবেই এ সম্বন্ধে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ ছিলেন ব'লেই জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সামরিক বল বাড়িয়ে চলেন; কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির অবিমৃষ্যকারিতার ফলে পশ্চিম য়ুরোপে যেরূপ দ্রুতগতিতে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের পতন ঘটে এবং তাতে জার্মানীর যতটা শক্তি বেড়ে যায় ততটা দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্মিলিতভাবে ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চালালে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির যে এরূপ অবস্থা দাঁড়াতে পারে এবং তার ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকেও যে পরে ভুগতে হবে একথা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সঙ্গে একটা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। কিন্তু হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হ'লে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি যে কোন সাহায্য করবে, শত চেষ্টা ক'রেও এমন কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে না পেরেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ হিটলারের অনাক্রমণ-চুক্তিতে সম্মত হন। বিপৎকালে সোভিয়েট শক্তিকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া তো দূরের কথা, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যখন সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করবার প্রস্তাব করলেন তখন তাতে পর্যন্ত তৎকালীন ইঙ্গ-ফরাসী কর্তাদের আপত্তি দেখা গেল। ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে তখন ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট coalition না হওয়ায় যে কতখানি ক্ষতি হয়েছে উত্তরকালে তার প্রমাণ ভালোভাবেই মিলেছে। রাজনৈতিক মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তখন নিছক সামরিক প্রয়োজনে সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে coalition করলে যুদ্ধ বোধ হয় আজ এতদূর গড়াতে পারত না।

য়ুরোপে স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে সাম্রাজ্যবাদী তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলো যে ভুল করেছিল, প্রাচ্যের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণেও গোড়ার দিকে সেই ভুলই তারা করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে চীন প্রাণপণ চেষ্টায় জাপানের বিরুদ্ধে লড়ে আসছে, অথচ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ সেই চীনকেই বাদ দিয়ে প্রথম দিকে military coalition অর্থাৎ সামরিক দল গঠনের প্রয়াস পায়। কেবল চীনকেই নয়, সাইবিরিয়ায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অত বড় শক্তিকেও অগ্রাহ্য করা হয়। জাপানের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ABCDFS অর্থাৎ American, British, Chinese, Dutch, French and Soviet coalition হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তা না হয়ে সেখানে হ'ল ABDF অর্থাৎ American, British, Dutch and French coalition. তারপর ফ্রান্সের পতন হওয়ায় ABD coalition হ'ল। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করা পর্যন্ত কার্যত চীনকে সামরিক ব্যাপারে পাত্তা দেওয়া হয়নি। নিতান্ত নিদানকালে বিধানের মতো শেষ মুহূর্তে ABCD অর্থাৎ American, British, Chinese and Dutch coalitionএর কথা ঘোষণা করা হয়। জাপানের প্রধান শত্রু চীনকে বাদ দিয়ে Military coalition গঠনের প্রয়াস সত্যই হাস্যকর ব্যাপার। পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ সময় থাকতে চীনের বিপুল সৈন্যদলের হাতে যথোপযুক্ত অস্ত্র তুলে দিলে ফাসিস্ত জাপান এত বড় সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ হয়তো পেত না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মোহ সামরিক দূরদৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রাখে ব'লেই পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ গোড়ার দিকে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেনি।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিতে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজদের অবরোধনীতি যেমন সফল হয়েছিল এবারের যুদ্ধে তা হয়নি। হিটলার প্রথমেই নরওয়ে দখল ক'রে তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বকে অনেকখানি নিরাপদ ক'রে নেন। তারপর হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের

পতনে তাঁর আটলান্টিক মহাসাগরে বেরুবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। য়ুরোপের পশ্চিম উপকূলে ঘাঁটি পেয়ে জার্মান সাবমেরিণগুলো আটলান্টিকে আক্রমণ চালাবার সুবিধে পায়। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এ সুবিধে পায়নি। ওদিকে উত্তর সাগরেও নরওয়ের ঘাঁটি পেয়ে জার্মান নৌবহরের চলাফেরা করবার সুবিধে হয়ে যায়। গত বারের মতো ইংরেজদের অবরোধনীতি সফল হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ জার্মান সাবমেরিণের অবাধ আক্রমণে আটলান্টিকের বক্ষে ইংরেজরাই এবার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ে। কাজেই বলা যায়, অবরোধনীতির দিক দিয়ে বৃটিশ স্ট্র্যাটেজি এবার ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের আকস্মিক পতনে বৃটেনের ওপর বিমানহানা চালাতেও হিটলারের সুবিধে হয়ে যায়। ইংলণ্ডে "লুফৎভাফে" চালিয়ে হিটলার অন্তত এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন যে, কিছুদিনের মতো বৃটেন থেকে পশ্চিম য়ুরোপে আর অভিযান চালানো সম্ভব হবে না। পশ্চিম য়ুরোপ সাময়িকভাবে নিরাপদ মনে ক'রেই হিটলার পূবদিকে সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সাহসী হন। মোট কথা, পোলাণ্ড-অভিযান থেকে আরম্ভ ক'রে বল্কান-অভিযান পর্যন্ত য়ুরোপীয় যুদ্ধ হিটলারের স্ট্র্যাটেজি অনুসারেই চলে; কিন্তু সোভিয়েট রণাঙ্গনে এসে জার্মান স্ট্র্যাটেজির ব্যত্যয় ঘটে।•সেখানে আর ব্লিৎস-এর নীতি খাটেনি; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ প্রতিরোধশক্তি যুদ্ধকে বিলম্বিত ক'রে তোলে। কারো কারো মনে এ-প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বৃটেন আক্রমণ না ক'রে হিটলার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে গেলেন কেন? এর সহজ উত্তর হ'ল এই যে, রাজনীতির কথা বাদ দিলেও সামরিক শক্তির বিচারে হিটলার বৃটেনকে খুব বড় শত্রু ব'লে কখনো মনে করেননি বা মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণও ছিল না। হিটলার আগাগোড়াই জানতেন যে, তাঁর প্রধান শত্রু সোভিয়েট শক্তি। কাজেই অত বড় শক্তিকে পশ্চাতে অক্ষত অবস্থায় রেখে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শত্রু বৃটেনকে আক্রমণ করতে তিনি যাননি। অথচ

জলপথে বৃটেন-অভিযানে ঝুঁকি ছিল অনেকখানি। বৃটেন-অভিযান ব্যর্থ হ'লে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট শক্তির কাছে হিটলারকে সহজেই হার মানতে হ'ত। পক্ষান্তরে সোভিয়েট শক্তির পরাভব ঘটলে য়ুরোপে ফাসিস্ত শক্তি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসত এবং সেইক্ষেত্রে বৃটেনকে আক্রমণ না করলেও হিটলারের বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। এজন্যেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি সোভিয়েট শক্তিকে পর্যুদস্ত করবার পরিকল্পনা করেন এবং তার ক্ষেত্রপ্রস্তুতি হিসেবে অত্যল্পকালের মধ্যে পশ্চিম য়ুরোপ ও বল্কান অঞ্চল দখল করে নেন। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র; কারণ সোভিয়েট শক্তি যে কতটা প্রচণ্ড হতে পারে তা তাঁর অজানা ছিল না। সেজন্যেই সোভিয়েট ভূমিতে অভিযান চালাবার মুখে হিটলার তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, সমগ্র জার্মান জাতি এক কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'ল। তার আগে আর কোনো যুদ্ধেই কিন্তু হিটলারের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুয়নি। হিটলার যে আশঙ্কা করেছিলেন তাই সত্যে পরিণত হ'ল। সোভিয়েট রণাঙ্গনে তাঁর "ব্লিৎসনীতি" খাটলো না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সোভিয়েট শক্তির পতন না হওয়ায় বৃটেন শক্তিসঞ্চয়ের সময় পেল এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার আবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে টেনে নামালো। ফলে ABS অর্থাৎ American, British and Soviet coalition-এর সৃষ্টি হ'ল এবং যুদ্ধের গতিও ফিরে গেল।

হিটলারকে সব চেয়ে বেশী ভুগতে হয়েছে তাঁর দুর্বল partner ইতালীকে নিয়ে। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর নৌবহর এবং উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর স্থলসেনার ওপর যদি হিটলার নির্ভর করতে পারতেন তবে হয়তো এত শীঘ্র তাঁর বিপদ ঘনিয়ে আসত না। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বৃটিশ নৌবহর। ফ্রান্সের পতনের পর ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহরকে একটা বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই সঙ্কটকালেও ইতালীর নৌবহর ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরকে কোথাও

"চ্যালেঞ্জ" করতে সাহসী হয়নি। সিঙ্গাপুর দখলের জন্যে জাপানের যেমন একটা পরিকল্পনা ছিল, জিব্রাল্টর দখলের জন্যে তেমন কোনো পরিকল্পনা অ্যাক্সিস পক্ষের থাকলে মিত্রপক্ষের অবস্থা কি হ'ত ঠিক বলা যায় না। ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের বাণিজ্যপথ বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু জিব্রাল্টর হাতে থাকায় সেখানে তাদের রণতরীর প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তারপর ইতালীর স্থলসেনা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বৃটিশ নৌঘাঁটিগুলো দখল করতে না পারায় তথাকার বৃটিশ নৌবহরের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। অথচ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে দেখা যায়, জাপানীরা বিদ্যুৎগতিতে নৌঘাঁটিগুলো দখল ক'রেই যুদ্ধ-এলাকা থেকে মিত্রপক্ষের, বিশেষ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, নৌবহরকে অনেক দূরে রাখতে সক্ষম হয়। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় হিটলার তাঁর বিমানবল দিয়ে ইতালীকে সাহায্য না করলে অনেক আগেই হয়তো মুসোলিনীর বিপদ ঘটতো। ইতালীর দুর্বলতার জন্যেই আজ হিটলারের দক্ষিণ পার্শ্ব বিপন্ন।

আধুনিক স্থলযুদ্ধের স্ট্র্যাটেজির পূর্ণপ্রকাশ হয়েছে জার্মান-সোভিয়েট রণাঙ্গনে। জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধ বাধবার পূর্ব পর্যন্ত জার্মান স্ট্র্যাটেজি জগদ্বাসীকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল; কিন্তু সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজির কাছে এখন জার্মান স্ট্র্যাটেজি ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। এটা কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়; কারণ আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। ম্যাক্স ভার্ণার তাঁর "Battle for the World" বইএ জার্মান-সোভিয়েট যুদ্ধ বাধবার আগেই লেখেন :—

"No, the Third Reich has no monopoly on victory. Modern war—the modern war of movement with modern offensive arms—is no German invention. Soviet strategy, for example, reached this concept before the Germans and prepared the technical means for it

earlier than the Germans. Co-operation and combination of all arms, the battle of annihilation in all its phases, penetration in depth, ruthless pursuit and encirclement—all these are methods of Soviet strategy too."

অর্থাৎ—না, জয়লাভ করা তৃতীয় রাইখের (নাৎসী জার্মানীর) একচেটে ব্যাপার নয়। আধুনিক যুদ্ধ—আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আধুনিক গতীয় যুদ্ধ চালানো জার্মান আবিষ্কার নয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, সোভিয়েট সমর-নীতিতে জার্মানদের আগেই এই ধারণা স্থান পায় এবং সোভিয়েট সমরনায়করা জার্মানদের আগেই তার কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। সকল বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন, প্রতিপক্ষকে সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করবার রণকৌশল, প্রতিপক্ষের ব্যূহের অন্তর্ভেদ, দ্রুতবেগে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন এবং প্রতিপক্ষকে পরিবেষ্টন প্রভৃতি কৌশলগুলো সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজিরও অন্তর্ভূ্ত।

আধুনিক নৌযুদ্ধের নতুন স্ট্র্যাটেজি দেখা গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। জাপান সেখানে নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমবায়ে 'সামুদ্রিক ব্লিৎস' চালায়।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আজ এই দু' স্ট্র্যাটেজির অনুসরণ ক'রেই যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা করছে। আধুনিক যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজির দিক দিয়ে যে তারা এ মহাসংগ্রামের গোড়ার দিকে অনেক পেছনে প'ড়ে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজি

য়ুরোপে দু'রণাঙ্গন এড়াবার জন্যে হিটলার কূটনৈতিক চাল হিসেবে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে অনাক্রমণ-চুক্তি করেছিলেন তার মূলে কোন সততা ছিল না; কাজেই পশ্চিম রণাঙ্গনে সম্পূর্ণ জয়লাভের পর সেই অনাক্রমণ চুক্তির প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে এল, তখন তিনি অনায়াসে চুক্তি লঙ্ঘন ক'রে অকস্মাৎ সোভিয়েট ভূমিতে সামরিক অভিযান চালালেন। হিটলার ভেবেছিলেন, পশ্চিম রণাঙ্গনে 'ব্লিৎস' চালিয়ে তিনি যেমন অত্যল্পকালের মধ্যে অভাবনীয় সামরিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সোভিয়েট ভূমিতেও বুঝি তেমনি বিদ্যুৎগতিতে তিনি বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা নিষ্ফল হয়েছে। জার্মান 'ব্লিৎস' ব্যর্থ হয়ে সোভিয়েট রণাঙ্গনে যুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম ক'রে তৃতীয় বর্ষেও চলেছে।

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ কঠোর হবে হিটলার একথা খানিকটা বুঝতে না পেরেছিলেন এমন নয়, কিন্তু যুদ্ধ যে এত দীর্ঘস্থায়ী হবে এ ধারণা তাঁর ছিল না বলেই মনে হয়। নাৎসী জার্মানীর সমরপ্রস্তুতি ও সমরনীতি স্বীকার করলে একথা বলতেই হয় যে, য়ুরোপের পূর্ব রণাঙ্গনেও অত্যল্পকালের মধ্যে যুদ্ধ জয় করাই ছিল তার লক্ষ্য। হিটলার ভেবেছিলেন, 'ব্লিৎস' চালিয়ে অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে আত্মরক্ষার অবসর না দিয়ে পর পর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলবেন এবং সেই আঘাতের মুখে ফ্রান্সের মতো সোভিয়েট শক্তিও অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু এখানে তাঁর বিচারে ভুল হয়ে গেছে। দু'কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট শক্তির তুলনা চলে না; প্রথমত ফ্রান্সের চেয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নানাদিক দিয়েই সমরসামর্থ্য ঢের বেশী অর্জন করেছিল; দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রাধান্য থাকায় সেখানে দলগত বিরোধের ফলে আত্মরক্ষার সময় ফরাসী যোদ্ধা ও

অযোদ্ধাদের মনোবল যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল, সাম্যবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তেমন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। অথচ হিটলার সোভিয়েট ভূমিতে অভিযান চালাবার সময় এরূপ একটা ভেদবুদ্ধির ওপর সম্ভবত খুবই নির্ভর করেছিলেন ; কারণ হিটলারের স্ট্র্যাটেজিতে সমরাস্ত্রের মতো প্রতিপক্ষের মধ্যে ভেদসৃষ্টির অপচেষ্টাও একটা প্রধান অস্ত্র। কিন্তু সোভিয়েট ভূমিতে হিটলার তাঁর রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হয়েছেন বা প্রয়োগে অবসরই পাননি। অতএব তিনি যে কেবল সোভিয়েট রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের পরিমাপেই ভুল করেছিলেন এমন নয়, পরন্তু লালফৌজ এবং সোভিয়েট জনসাধারণের মনোবল সম্বন্ধেও তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন।

নাৎসী বাহিনীর দুর্বার বেগ সহ্য করবার মতো শক্তি লালফৌজের ছিল বলেই আজ যুদ্ধপরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়ে উঠেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলও কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এক বক্তৃতায় একথা স্বীকার করেন। তিনি তাতে বলেন :—

> "মুহূর্তের জন্যেও আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, স্থলযুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত রুশ বাহিনীই বহন করছে। বর্তমানে জার্মানীর ১৯০ ডিভিসন সৈন্য এবং তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের ২৮ ডিভিসন সৈন্যকে লালফৌজ তাদের রণাঙ্গনে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি এই হিসেবের কথা তুলছি কেবল এজন্যে যে, তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, আমরা তিউনিসিয়ায় মাত্র ১৫ ডিভিসন সৈন্য ধ্বংস করেছি এবং তাতে আমাদের হতাহত হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার লোক।"

মিঃ চার্চিলের এই উক্তি উদ্ধৃত করবার পর গত মহাযুদ্ধের কিছু তুলনামূলক হিসেব দিলে বোঝা যাবে, পূর্ব রণাঙ্গনে লালফৌজকে কি ভীষণ চাপ সহ্য করতে হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর মোট যত সৈন্য ছিল রুশ রণাঙ্গনে কখনো তার এক-চতুর্থাংশের বেশী নিয়োজিত হয়নি। ১৯১৫

খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই রুশ রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্য নিয়োজিত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার জার্মান সৈন্য তখন সেখানে নিয়োজিত হয়েছিল; কিন্তু সে সময় য়ুরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী নিয়োজিত করেছিল ১৯ লক্ষ সৈন্য। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রুশ রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৯০ হাজার, আর পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধ করছিল ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য।

গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর এক-চতুর্থাংশ সৈন্যের কাছেই জারের রুশ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল, জার্মানীর সমস্ত শক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত হ'লে তখন কি অবস্থা দাঁড়াত বলা যায় না। গত মহাযুদ্ধেও অবশ্য অস্ত্রবল এবং সামরিক সংগঠনে জার্মান বাহিনীই য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ ছিল; কিন্তু হিটলারের বাহিনী কাইজারের বাহিনী অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিশালী এবং সমরবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী। তদুপরি প্রায় সমগ্র য়ুরোপের শক্তি নাৎসী বাহিনীর পেছনে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এই বিরাট ফাসিস্ত শক্তিকে বাধা দিতে গিয়ে লালফৌজ যে অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর সমরপরিকল্পনা যে 'ব্লিৎস'এর ভিত্তিতেই করা হয়েছিল রুশ-জার্মান যুদ্ধের খবর যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছেন তাঁরাই তার প্রমাণ পেয়েছেন। বিখ্যাত সমরবিশারদ Max Werner তাঁর The Great Offensive নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। জার্মান সেনানীমণ্ডলীর এককালীন বিশিষ্ট নায়ক জেনারেল ফন হাসএর যে উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তা এরূপ:—

"এই যুদ্ধের সমস্ত অভিযানেই জার্মান রণকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তার আক্রমণে আকস্মিকতা এবং প্রচণ্ড গতি। অকস্মাৎ সংহত আক্রমণের উদ্দেশ্য হ'ল প্রতিপক্ষকে বিব্রত ক'রে তাকে শক্তিহীন ক'রে ফেলা।"

যান্ত্রিক যুদ্ধবিশারদ খ্যাতনামা জার্মান জেনারেল গুডারিয়ানএর অভিমতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন :—

"দ্রুত গতি শত্রুকে বিভ্রান্ত ক'রে ফেলে। প্রধান লক্ষ্যস্থলগুলোতে শক্তি সংহত করলে বল বৃদ্ধি পায়। সংহত শক্তি নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ চালানোই জয়লাভের নিশ্চিত পন্থা।"

জার্মান সমরনায়কগণ সোভিয়েট রণাঙ্গনে এই নীতিতে যুদ্ধ চালাতে গিয়েই বিপদ ডেকে আনেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে 'ব্লিৎস'এ অসামান্য সাফল্য-লাভ ক'রে তাঁদের এই রণনীতির ওপর আস্থা অসম্ভব রকম বেড়ে যায় এবং তাঁদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, সোভিয়েট রণাঙ্গনেও তাঁরা 'ব্লিৎস' চালিয়েই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন। জার্মান স্ট্যাটেজিতে কোনরূপ ভুল থাকতে পারে একথা হয়তো তাঁরা একবার ভেবেও দেখেননি; কিন্তু স্ট্র্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজির কাছে জার্মান স্ট্র্যাটেজি কিরূপ শোচনীয়ভাবে মার খেতে পারে। লালফৌজের বাহুবেষ্টনের মধ্যে প'ড়ে সেখানে এক বিরাট জার্মান বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। অথচ জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ আগাগোড়া তাঁদের এই স্ট্র্যাটেজিরই গর্ব ক'রে এসেছেন। লালফৌজের চেয়ে সৈন্যবল ও অস্ত্রবলে জার্মানরা বেশি শক্তি-শালী—জার্মান হাই-কম্যাণ্ড একথা কখনও স্বীকার করেননি; কিন্তু এ-গর্ব তাঁরা সর্বদাই করেছেন যে, সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজির তুলনায় জার্মান স্ট্র্যাটেজি উন্নততর এবং একমাত্র উন্নত স্ট্র্যাটেজির বলেই জার্মানরা সোভিয়েট রণাঙ্গনে সাফল্য লাভ করেছে।

সোভিয়েট রণাঙ্গনের অনেক স্থলেই জার্মান বাহিনীর অস্ত্রবল ও জনবলের আধিক্য যে তাদের প্রাথমিক সাফল্যের কারণ, একথা অনেক সূত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্তত মস্কোর যুদ্ধে যে জার্মান ট্যাঙ্ক ও বিমানের সংখ্যা লাল-ফৌজের তুলনায় অনেক বেশী ছিল এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মস্কোর যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয় কেন হ'ল, তার মূল কারণ

অনুসন্ধান করতে গেলে জার্মান স্ট্র্যাটেজির পরাজয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

অতএব জার্মান হাই-কম্যাণ্ড যে 'ব্লিৎস'-এর গর্ব করতেন, সোভিয়েট রণাঙ্গনে তা খর্ব হয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে কেবল স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, এপর্যন্ত সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজিতেই সংগতি রক্ষা পেয়ে এসেছে। সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে 'ব্লিৎস'কে 'ব্লিৎস' দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা না ক'রে ক্রমশ শক্তি সংহত করা এবং বিলম্বিত যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ক্রমশ শক্তিহীন ক'রে এনে অবশেষে একবারে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে তাকে পরাভূত করা। এজন্যেই লালফৌজ প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায় সীমান্তের যুদ্ধে অনেক স্থলে হটে আসে এবং স্ট্র্যাটেজিক স্থান বুঝে বুঝে প্রতিপক্ষকে ঘা দিয়ে চলে। তারপর ক্রমশ শক্তি সংহত ক'রে তারা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং প্রতিপক্ষের সৈন্য ও অস্ত্রবল হ্রাস করতে থাকে। বলা বাহুল্য, বিস্তৃত দেশ, প্রচুর জনবল এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থাকায়ই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের এই স্ট্র্যাটেজি অবলম্বনে বিশেষ সুবিধে হয়েছে। সর্বোপরি উন্নত মনোবলই সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজির মেরুদণ্ড।

যুদ্ধের চরম ফলাফল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না এবং আধুনিক সার্বিক যুদ্ধকে কেবল একটি বিশেষ দিক থেকে বিচার ক'রে তার পরিণতি সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলাও কঠিন। তবে রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল দৃষ্টে এখন একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, নিখুঁত ও উন্নত স্ট্র্যাটেজিজ্ঞান কেবল জার্মান সমরনায়কদেরই একচেটে ব্যাপার ব'লে তাঁদের মনে যে দম্ভ ছিল, সোভিয়েট সমরনায়কগণ তাঁদের সেই দম্ভ ভেঙে দিয়েছেন।

সমরবিবর্তনে লালফৌজ

সমরায়োজন, সংগঠন ও অস্ত্রবলে জার্মানী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম নয়। তারপর লালফৌজ যান্ত্রিক যুদ্ধ ও আধুনিক রণকৌশলের প্রবর্তক হ'লেও নাৎসী জার্মানী তার অনুসরণ ক'রে এবিষয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য অর্জন ক'রে এবং রুশ-জার্মান যুদ্ধের আগে অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে জার্মান বাহিনী অদ্বিতীয় এবং স্থলযুদ্ধে তারা একরূপ অজেয়। বিশেষত ফ্রান্সের পতনের পর লোকের মনে এ বিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হয়েছিল। ফ্রান্সে জয়লাভের পর হিটলার দম্ভভরেই বলেছিলেন, জার্মান বাহিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় কারো সাধ্য নেই তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। জার্মান সৈন্যদের মনেও এরূপ একটা ধারণা হয়েছিল তারা বুঝি সত্যিই অজেয়। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস সাময়িক ভাবে তাদের মনোবল ও রণশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারই ফলে তারা সোভিয়েট ভূমিতে অভিযানের প্রথম পর্বে সাফল্যের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু লালফৌজের পাল্টা আক্রমণে সেই বিশ্বাস তাদের এতদিনে ভেঙ্গে গেছে এবং তার প্রতিক্রিয়াও তাদের মনে নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে।

য়ুরোপে একের পর এক দেশ দখল ক'রে জার্মান বাহিনীর কেবল মনোবল এবং যুদ্ধোদ্যমই যে বেড়ে যায় এমন নয়, সমরসম্ভার এবং জনবলের দিক দিয়েও জার্মানী যথেষ্ট লাভবান হয়। য়ুরোপের কোন দেশ দখল করবার আগে একক ভাবে জার্মানীর সামরিক বল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম ছিল; কিন্তু একে একে দেশগুলো দখল করবার পর জার্মানীর সামরিক বল বহুলাংশে বেড়ে যায়। ফরাসী বাহিনী, বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী বেলজিয়ান বাহিনী এবং ওলন্দাজ বাহিনীতে মিলে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের

১২০ ডিভিসন সৈন্য ছিল। তাদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্রই জার্মানদের হস্তগত হয়। রণাঙ্গনে লব্ধ অস্ত্র ব্যতীত জার্মানরা মিত্র-পক্ষের রিজার্ভ অস্ত্রগুলোও পায়। তাছাড়া য়ুরোপের অস্ত্রের কারখানাসমূহও তাদের হাতে যায়। এমন কি অনধিকৃত ফ্রান্সেও অস্ত্রের কারখানাসমূহে জার্মানীর জন্যে অস্ত্রোৎপাদন হয়। য়ুরোপে ফ্রান্সের মতো মোটর নির্মাণের কারখানা এবং জাহাজখানা আর কারো ছিল না। সেগুলো জার্মানরা দখল করে। জার্মানীর বিরাট ক্রুপ ও রাইন মেটাল কারখানার সঙ্গে যুক্ত হয় চেকোস্লোভাকিয়ার বিরাট অস্ত্রের কারখানা স্কোডা ও ফ্রান্সের শ্‌নাইডার-ক্রুসো কারখানা। এর ফলে কামান নির্মাণে জগতে জার্মানী অদ্বিতীয় শক্তি লাভ করে। এতদ্ব্যতীত ফরাসী-বেলজিয়ান অস্ত্রাগারসমূহ, হল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফকার ও কোলহোভেন বিমানের কারখানা, ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ মেশিনগান নির্মাণের ম্যাডসেন কারখানা, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের জাহাজখানাসমূহ হাতে পাওয়ায় জার্মানীর সামরিক বল বাড়াতে খুবই সুবিধে হয়ে যায়। কেবল আস্ত্রোৎপাদনই নয়, জার্মানীর বিস্তর কাঁচা মালও হস্তগত হয়। জার্মানীর আগে লোহার খুবই অভাব ছিল; কিন্তু ফ্রান্সের সঞ্চিত লোহা হাতে পেয়ে য়ুরোপে লৌহসম্পদে সে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী হয়ে ওঠে। রুমানিয়ার তেলের খনিগুলোতে কর্তৃত্ব পাওয়ায় তার তেলের অভাবও কতকাংশে মেটে। এছাড়া ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হাঙ্গারী, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষিজাত পণ্য পেয়ে জার্মানীর খাদ্য সরবরাহে যথেষ্ট সুবিধে হয়ে যায়। এতদ্ভিন্ন জার্মানী তার পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলো থেকে যথেষ্ট সৈন্য পায়। দ্বিতীয় বর্ষের অভিযানে রুশ রণাঙ্গনে সে যে ২৪০টি ডিভিসন নিয়োজিত করে তার ৬১টি ডিভিসনই জার্মানীর মিত্রশক্তিবর্গের; বাকী ১৭৯টি ডিভিসন জার্মানীর। দ্বিতীয় বর্ষে সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মানদের পক্ষে ছিল ২৪০ ডিভিসন; তৃতীয় বর্ষে তা বেড়ে ২৫৭ ডিভিসনে এসে দাঁড়ায়। এ থেকেই বোঝা যায়, অন্যান্য দেশ দখল ক'রে জার্মানীর সামরিক বল কত বৃদ্ধি পায়।

পক্ষান্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হারাতে হয় এবং তার বহু শিল্পপ্রধান নগরী প্রতিপক্ষের হাতে পড়ে। মিত্র রাষ্ট্র বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সোভিয়েট শক্তি কিছু সাহায্য পেয়েছে সত্য, কিন্তু তা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ কতটা হয়েছে বলা শক্ত। কার্যত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একাই লড়তে হয়েছে। একদিকে জার্মানীর এত সম্পদ লাভ, অপর দিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় বিরাট ক্ষতি। তা সত্ত্বেও লালফৌজের প্রবল আক্রমণে আজ জার্মান বাহিনী বিষম বিপর্যস্ত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে খবর বেরুয় যে, উরাল এলাকায় সোভিয়েট শিল্পোৎপাদন নাৎসীপক্ষভুক্ত সমগ্র য়ুরোপের শিল্পোৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কত দ্রুত শক্তি অর্জন করতে সক্ষম। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর দিবসে মার্শাল স্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায়ও বলেছেন :—

"এ যুদ্ধের প্রারম্ভে সোভিয়েট রাষ্ট্র যতখানি শক্তিশালী ছিল তদপেক্ষা আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে এ যুদ্ধ থেকে সে নিষ্ক্রান্ত হবে।"

অস্ত্রবলই যদি যুদ্ধজয়ের একমাত্র উপায় হ'ত তবে জার্মানী যে বিপুল শক্তি নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল তাতে সোভিয়েট পক্ষের ভেঙ্গে পড়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। স্ট্যালিনগ্রাডে লালফৌজের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, জার্মানীতে কোথাও তেমন হ'লে খুব সম্ভব জার্মানরা ভেঙ্গে পড়ত। লালফৌজ যে ভেঙ্গে পড়েনি তাতেই পাওয়া যায় তাদের অসাধারণ মনোবলের পরিচয়। তাছাড়া সোভিয়েট সৈনাপত্যের কৃতিত্বও এতে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট সৈনাপত্য ও সমর পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের অভিযান সুরু হবার কিছুদিন পর মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলেন, "উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের অভিযান সামরিক বিচারে যে ঠিকই হয়েছে একথা মঃ স্ট্যালিনও বলেছেন।" এরদ্বারাই বোঝা

যায়, মিত্রশক্তিবর্গের কাছে সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজি আজ কতখানি সম্মান পাচ্ছে।

লালফৌজ তথা সমগ্র সোভিয়েট অধিবাসীর মনোবলের কাছেই প্রবল শক্তিশালী জার্মান বাহিনীর আজ পরাজয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। অস্ত্রবলে, সামরিক সংগঠনে এবং রণকৌশলে ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েট বাহিনীর চেয়ে অন্তত ফ্রান্সের পতনের পর নিকৃষ্ট ছিল না, বরঞ্চ অধিকতর শক্তিশালী হওয়াই সম্ভব; কিন্তু মনোবলে ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েট বাহিনীর সমকক্ষ হতে পারেনি। সোভিয়েট বাহিনী দেশপ্রেম, মানবতা ও সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত; আর ফাসিস্ত বাহিনী দম্ভ, স্বাজাত্যাভিমান ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত ও মদগর্বে প্রমত্ত। ফাসিস্তবাদের সাময়িক উত্তেজনা পরিণামে স্তিমিত হয়ে আসাই স্বাভাবিক—তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না এবং একবার বিপদ দেখা দিলেই তাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। এই দ্বিধাই সংগ্রামে মনোবলরক্ষার প্রধান অন্তরায়। তদুপরি ফাসিস্তরা অতিমানবে বিশ্বাসী এবং যে-কোন দুর্যোগেই তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে সাম্যবাদী লালফৌজ যুক্তিবাদী এবং সেজন্যেই আদর্শের প্রতি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ়। কাজেই চরম দুর্দিনেও তাদের মনোবল রক্ষা করা সম্ভব। এই মনোবলই যুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র। অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও মনোবল হারিয়ে যে পরাজয় ঘটে তার দৃষ্টান্ত গত যুদ্ধের ইতিহাসেও রয়েছে। বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট তাঁর "The Strategy of Indirect Approach" নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

"The conclusion does not imply that at the moment of the Armistice Germany's military power was broken or her armies decisively beaten."

অর্থাৎ—এ সিদ্ধান্তের দ্বারা এ বোঝায় না যে, যুদ্ধবিরতির সময় জার্মানীর

সামরিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল বা তার সৈন্যদল চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল।

আসলে জার্মানরা যুদ্ধের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের মনোবলের বিনষ্টিই গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ডেকে এনেছিল। এবারও তারই লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

সামরিক জগতে এতকাল একটা প্রবাদবাক্য চলে এসেছে, "An army marches on its stomach," অর্থাৎ খেতে পেলেই সৈন্যরা যুদ্ধ করে। কিন্তু লালফৌজের কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন, একমাত্র খেতে পেলেই সৈন্যরা ভালো যুদ্ধ করে না; বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত আদর্শের প্রেরণাও তাদের চাই। "An army marches on its head," অর্থাৎ সৈন্যরা মগজে চলে, লালফৌজের কর্তৃপক্ষ এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেজন্যেই তাঁরা কেবল cannon fodders অর্থাৎ কামানের মুখে মরবার জন্যই সৈন্যদের শিক্ষা দেন নি; প্রত্যেক সৈন্যকে তাঁরা রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক সোভিয়েট সৈন্যই যাতে যুক্তি দিয়ে যুদ্ধকে বুঝতে পারে তাঁরা তার চেষ্টা করেছেন। এখানেই জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যদের তফাৎ। জার্মান সৈন্যরা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধকে বোঝবার যে চেষ্টা করে না, অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তাঁর "Russia Resists" নামক পুস্তকে তার একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :—

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসী অভিযান সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ব্যাভেরিয়ার ল্যান্স কর্পোরাল জোহান মেয়ার বলেন, "ঘটনা কিভাবে গড়ালো আমি জানিনে। সৈনিকের কাজ হ'ল আদেশ পালন করা, আমার ভাববার কোন অধিকার নেই, কেননা ফুরারই আমার জন্যে ভাবেন।"

বন্দী হবার পর জার্মান পক্ষের হার্বার্ট রয়সলার নামে আর একজন সিনিয়র কর্পোরালও প্রশ্নোত্তরে বলেন :—

প্রশ্ন : "আপনি কি কাগজ পড়েন ?"

উত্তর ঃ "না। আমি আমার উর্দ্ধতন কর্তাদের আদেশ পালন করি।"

প্রশ্নঃ "কেন, আপনি কি মানুষ, না মেশিন?"

উত্তর ঃ "হাঁ, আমি মেশিন। আমরা সকলেই মেশিন।"

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না, লালফৌজ ও ফাসিস্ত বাহিনীতে পার্থক্য কোথায়।

লালফৌজ সামরিক জগতে এক নতুন ভাবধারার প্রবর্তক। সৈন্যদলে রাজনৈতিক চেতনা থাকলে তারা ভালো যোদ্ধা হয় একথা আজ প্রতিপন্ন হয়েছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সৈন্যদলের মনোবল বেশী এ সত্যটাও আজ আর চাপা নেই। সমাজতন্ত্রের ভেজাল মিশিয়েই ফাসিস্ত শক্তি সামরিক বলে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়া পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলোর ওপর টেক্কা মারে; কিন্তু আসল সমাজতান্ত্রিক শক্তির কাছে এসে আজ তাকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। কাজেই ভাবীকালে জগতের সামরিক সংগঠনে লালফৌজের প্রভাব পড়তে বাধ্য এবং ইতিমধ্যেই গোঁড়া পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলোতে তার খানিকটা প্রভাব পড়েছেও। 'টোটাল ওয়র' অর্থাৎ সার্বিক যুদ্ধে সর্বসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার এবং সেজন্যেই এযুগে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি অর্জন করতে হলে people's army অর্থাৎ জনসেনা গ'ড়ে তুলতে হবে। সোভিয়েট লালফৌজই জনসেনার যথার্থ প্রতীক। কাজেই বিভিন্ন দেশ ভবিষ্যতে যে-নামেই সৈন্যদল গড়ে তুলুক না কেন, যথার্থ সামরিক বল অর্জন করতে হ'লে তারা লালফৌজের অনুকরণেই সৈন্যদল গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

লালফৌজের অনুকরণে People's army অর্থাৎ জনসেনা গড়ে তুলতে হ'লে বিভিন্ন দেশে People's Government অর্থাৎ জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় থাকবে না; কেননা জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া জনসেনা গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং

লালফৌজের বিজয়াভিযানের মধ্যে এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই আজ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ফ্রান্সের বিপ্লবী সৈন্যদলের আবির্ভাবে যেমন একদিন সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছিল, লালফৌজের আবির্ভাবেও আজ তেমনি পুঁজিতন্ত্রের পতন আসন্ন ব'লে মনে হচ্ছে।

ট্যাঙ্কযুদ্ধের ভবিষ্যৎ

সমর-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স ভার্ণার তাঁর "The Great Offensive" নামক পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন :—

"লালফৌজ যে সামরিক ভিত্তি স্থাপন করেছে তার ওপর মিত্রপক্ষের জয়ের সৌধ গড়ে উঠতে পারে। রুশিয়া মিত্রপক্ষের অনেক সুবিধে ক'রে দিয়েছে, কাজেই আর সামান্য কিছু চেষ্টা করলেই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভ করা সম্ভব। লালফৌজ যে-শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে মিত্রপক্ষ মাত্র তার চার ভাগের এক ভাগ শক্তি নিয়েও য়ুরোপে নেমে যদি অ্যাক্সিস পক্ষের ওপর চাপ দিতে পারে, তবেই মিত্রপক্ষের জয়লাভ করা সম্ভব হবে।"

সুতরাং উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের জয়লাভ এবং তাদের ইতালী-অভিযান নিয়ে যতই জয়ঢাক পেটানো হোক না কেন, আসলে বর্তমান মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের তরফ থেকে প্রধান সামরিক দায়িত্ব বহন করছে সোভিয়েট শক্তি। কেবল ম্যাক্স ভার্ণার বলেছেন ব'লেই কথাটা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যুদ্ধের ফলাফল নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে দেখলে যে-কেউ এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা এবং

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করলে কোন অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও ম্যাক্স ভার্ণারের সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

তৃতীয় বর্ষেও সোভিয়েট রণাঙ্গনে ওরেল-বিয়েলগোরড এলাকায় জার্মানরা তাদের ট্যাঙ্কবহর নিয়ে যে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করে তার তুলনায় মিত্র-পক্ষের অন্যান্য রণাঙ্গনের প্রখরতা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। মাত্র দু'শ' মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে জার্মান সেনাপতি ফন ক্লুগ ১৫টি পানৎসার অর্থাৎ জার্মানীর সেরা ট্যাঙ্ক ডিভিসন এবং ১৪টি পদাতিক ডিভিসন নিয়ে আক্রমণ চালান। ফন ক্লুগ-এর এই ট্যাঙ্কবাহিনীতে যেসব সাত ইঞ্চি পুরু বর্মে আচ্ছাদিত 'বাঘা' ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করা হয়েছিল জার্মানরা সেগুলো একরূপ দুর্ভেদ্য ব'লেই জানতো; কিন্তু তাদের সেই বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়ে লালফৌজের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানগুলো গোলাবর্ষণ ক'রে জার্মান 'বাঘা' ট্যাঙ্কগুলোর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দিয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, জার্মানদের এতবড় ট্যাঙ্ক-আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে লালফৌজকে প্রথম তিন দিন কোনো ট্যাঙ্কই নিয়োজিত করতে হয়নি। কেবল ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনী এবং বিমানবলের সাহায্যেই তারা জার্মানদের ট্যাঙ্ক-আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে; শুধু ঠেকিয়েই রাখেনি, তারা জার্মানদের প্রভূত ক্ষতি করেও ছেড়েছে। প্রথম দিনেই জার্মানদের প্রায় ৮০০ ট্যাঙ্ক খোয়া যায় ব'লে সোভিয়েট পক্ষ দাবী জানায়। তার পরের খবরেই প্রকাশ পায় যে, ছ'দিনের যুদ্ধে জার্মানদের প্রায় দু'হাজার ছ'শ, ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত এবং কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া তাদের হাজারখানেক বিমানও খোয়া যায়। এত বড় ক্ষতি স্বীকার ক'রেও জার্মানরা একমাত্র বিয়েলগোরডের দিকে খানিকটা অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোথাও সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি।

এই যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য সোভিয়েট ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে জার্মান পানৎসার বাহিনীর পরাজয়। প্রথম তিনদিন কেবল ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ও রাইফেলের সাহায্যে জার্মানদের অনেকগুলো ট্যাঙ্ক ধ্বংস

ক'রে তারপর চতুর্থ দিনের যুদ্ধে লালফৌজ ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করে। জার্মান বাহিনীর তখন আক্রমণ চালানো তো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করতে পারলেই তারা বাঁচে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের অভিযান বন্ধ করতে হয়।

সোভিয়েট ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর এই অপূর্ব সাফল্য বর্তমান মহাযুদ্ধে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই যুদ্ধের গোড়ায় ট্যাঙ্কই স্থলযুদ্ধের চরমাস্ত্র ব'লে বিবেচিত হয় এবং জার্মানীর অসামান্য সাফল্যের মূলে ছিল তার দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্কবাহিনী। তাছাড়া এযাবৎ এ ধারণাটাও একরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ট্যাঙ্ক ছাড়া ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। অবশ্য ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানবন্দুক সব দেশেই কিছু কিছু প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু সেগুলোর ওপর যে একান্তভাবে নির্ভর করা যায়, এ বিশ্বাস কারো ছিল না।

গত মহাযুদ্ধ থেকে এ মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান হাল্কা অস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল। সাধারণত ২০ এম-এম (এক ইঞ্চি ব্যাসেরও কম) অপেক্ষা বড় ব্যাসের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান প্রস্তুতের প্রয়োজন তখনও তেমন কেউ উপলব্ধি করেনি। ২০ এম-এম ব্যাসের কামানের গোলা বড় জোর ২০ এম-এম পুরু বর্ম ভেদ করতে সক্ষম। কাজেই প্রথম দিকে ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ছোট কামানগুলোর সাহায্যে কেবল সময় সময় এক ইঞ্চি পুরু বর্মাবৃত সাঁজোয়া গাড়ী ও হাল্কা ট্যাঙ্কই ঘায়েল করা সম্ভব হ'ত; স্পেনের গৃহযুদ্ধে দেখা যায়, খুব কাছাকাছি না হ'লে তাও পারা যায় না (Weapons and Tactics—by Tom Wintringham).১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অবস্থাই ছিল। স্পেনে ৩৭ এম-এম ব্যাসের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ব্যবহার ক'রে অনেক হাল্কা ট্যাঙ্কের বর্মভেদ করা সম্ভব হয়েছিল; তবে ৪৫ ও ৪৭ এম-এম ব্যাসের ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামানগুলোই সেখানে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বোঝা যায় যে, ট্যাঙ্কের বর্ম অধিকতর পুরু করবার জন্যে বিভিন্ন দেশে চেষ্টা চলেছে। অত্যল্পকালের মধ্যেই এই চেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হয় এবং মোটা বর্ম পরে'

ট্যাঙ্কগুলো যতটা দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে, ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের শক্তি তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে খবর পাওয়া যায় যে, জার্মানরা ১০৫ এম-এম (৪॥ ইঞ্চি) ব্যাসের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ব্যবহার করছে। তারপর মিত্রপক্ষও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের শক্তি বাড়াবার দিকে যথেষ্ট নজর দেয়। ৭ ইঞ্চি পুরু বর্মাবৃত ৬ নম্বর 'বাঘা' ট্যাঙ্কগুলো যখন জার্মানরা যুদ্ধে প্রথম নামিয়েছিল তখন তারা গর্ব ক'রেই বলেছিল যে, সেগুলোর বর্ম ভেদ করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মান 'বাঘা' ট্যাঙ্ক তেমনভাবে ঘায়েল না হ'লেও সোভিয়েট রণাঙ্গনে তার দুর্ভেদ্যতার গর্ব ভালোভাবেই ভেঙ্গেছে। জার্মান 'বাঘা' ট্যাঙ্কের ৭ ইঞ্চি পুরু বর্ম যেসকল সোভিয়েট ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের গোলায় ভেদ হয়েছে সেই সব কামানের ব্যাস নিশ্চয়ই ১৪০ এম-এমএর কম হবে না। এ থেকেই বোঝা যায়, কয়েক বছরের মধ্যে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের শক্তি কতদূর বেড়েছে।

বর্তমান মহাযুদ্ধে প্রথমে ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর আশাতীত সাফল্যের খবর পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মস্কো-রণাঙ্গন থেকে। সেখানে লালফৌজের চেয়ে জার্মানদের ট্যাঙ্ক ও বিমান ছিল ঢের বেশী। মঃ স্ট্যালিন তখন এক ঘোষণায় বলেছিলেন 'যে, জার্মানদের সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও বিমানে সোভিয়েট বাহিনীর পাল্লা দিয়ে ওঠা কঠিন; তাদের দু'প্রকার অস্ত্রেরই সংখ্যা বেশী। অতএব জার্মান ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে হ'লে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও বিমানধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর উৎকর্ষবিধান করতে হবে। বলা বাহুল্য, মস্কোযুদ্ধ থেকেই তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তারপর একটা বড় রকমের পরীক্ষা হয়ে যায় খারকফে। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষে ফাসিস্ত বাহিনীর স্ট্যালিনগ্রাড-অভিযান সুরু হবার আগে মার্শাল টিমোশেঙ্কো খারকফ দখলের জন্যে একবার চেষ্টা করেন। সেখানেও কেবল ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে স্থানে স্থানে জার্মান ট্যাঙ্কবহরকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হয়। তখনও পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনী এই পরীক্ষায়

সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরই আরম্ভ হয় জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযান এবং তা গিয়ে স্ট্যালিনগ্রাডের দ্বারে ঠেকে।

এদিকে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধেও তখন মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর সাফল্যের খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যেত। প্রথম দিকে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ও রাইফেল কেবল আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হ'ত; কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষ সেগুলো ক্রমশ আক্রমণের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করে এবং লিবিয়ার যুদ্ধে তারা সেদিক দিয়ে অনেকটা সফলও হয়। ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর ক্রমোন্নতির ফলে মারণাস্ত্র হিসেবে ট্যাঙ্কের অপ্রতিহত শক্তি যে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে এটা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হ'তে থাকে। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে লালফৌজ এ নিয়ে পরীক্ষা করবার আরো ভালো সুযোগ পায় এবং তারপরে কুরস্ক-বিয়েলগোরোড এলাকায় সোভিয়েট ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর বিস্ময়কর সাফল্য তারই পরিণতি।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্মান নিউজ এজেন্সীর এক খবরে বলা হয় যে, সোভিয়েট রণাঙ্গনে লালফৌজ জার্মান ট্যাঙ্কধ্বংসের জন্যে স্থলযুদ্ধেও 'চুম্বক মাইন' ব্যবহার করছে। এ খবর সত্য হয়ে থাকলে বলতে হয়, লালফৌজের ট্যাঙ্কধ্বংসী ব্যবস্থা আশাতীত রূপে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। লালফৌজের ট্যাঙ্কধ্বংসী ব্যবস্থার সাফল্য দেখে সামরিক জগতে আজ এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে যে, স্থলযুদ্ধে ট্যাঙ্ক আর চরমাস্ত্র হিসেবে বেশিদিন দাঁড়াতে পারবে কিনা?

জাপানের স্ট্র্যাটেজি

মিত্রপক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান আসন্ন একথা নানা মহল থেকেই শোনা যাচ্ছে। ওদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়ও মিত্রপক্ষীয় সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার একে একে দ্বীপদখলের চেষ্টা করছেন। কিভাবে জাপানকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যায়, নানাস্থানে বিভিন্ন বৈঠকে এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনাও হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের জয়, মুসোলিনীর পতন এবং সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ব্যর্থতা ও লালফৌজের প্রত্যাক্রমণের প্রভাব সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনেও পড়তে বাধ্য। য়ুরোপে অ্যাক্সিস শক্তির বিক্রম যতই কমে আসবে, বৃটিশ এবং মার্কিন শক্তিও ততই বেশী প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের দিকে নজর দেবার সুযোগ পাবে। পূর্বের তুলনায় এখন অবস্থা খানিকটা মিত্রপক্ষের অনুকূল দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাবার পক্ষে সুবিধে অসুবিধের কথাই এখানে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলা দরকার, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপান তার প্রতিপক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন শক্তিকে ঘা দিয়ে যথেষ্ট বলসঞ্চয়ে সমর্থ হয়। মূল এসিয়াখণ্ডে তো সে বিস্তীর্ণ এলাকা পায়ই, তদুপরি যতগুলো দ্বীপ তার হস্তগত হয় জগতে আর কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই এতগুলো দ্বীপ দখলে নেই। মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জ, মাঞ্চুকুও, চীনের অধিকৃত এলাকা, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মিলে তার যে বিরাট সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছে তার লোক সংখ্যা ৪০ কোটির কম হবে না। এসিয়ার অর্থনৈতিক সম্পদের বেশীর ভাগই তার হাতে পড়ে। জগতের উৎপাদন ধরলে রবার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, টিন শতকরা প্রায় ৫৫

ভাগ, চা শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ, চিনি শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ, চাল শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ, পেট্রোল (ক্রুড) শতকরা প্রায় ৫ ভাগ, টাংস্টেন শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এবং ফসফেট্স্ শতকরা প্রায় ৮ ভাগ তার হস্তগত হয়। এর ফলে পূর্ব এসিয়ায় সামরিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জাপান সামরিক ঘাঁটিগুলো দখল করে এবং তার অর্থনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এল্যুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ওসিয়ানিয়া থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক বিস্তৃত এলাকায় সে সামরিক আধিপত্য লাভ করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন, বৃটিশ ও ওলন্দাজদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর ও সুরাবায়া জাপানী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মার্কিন ও বৃটিশ শক্তি হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষে বাধ্য হয়ে সরে আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষের সমরনীতিতে এই সঙ্কট দেখা দেবার মূলে অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান। প্রধান কারণ তাদের সমরনীতিতে যথেষ্ট সহযোগিতার অভাব। গোড়ার দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কেবল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে জাপানকে বাধা দেবার কথা চিন্তা করে। চীনকে বাদ দিয়ে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে নিয়ে সম্মিলিত দল গঠন করা হয়। য়ুরোপে ফ্রান্সের পতনের পর তা আমেরিকা, বৃটেন ও ডাচ (ওলন্দাজ) অর্থাৎ এ-বি-ডি দলে পরিণত হয়।* এসিয়ার দু'টি বৃহৎ শক্তি চীন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সেই দলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তার ফলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মিলিত সমরপ্রচেষ্টা এসিয়া মহাদেশের অন্তস্তলে প্রবেশ না ক'রে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ দেখা যায়, প্রথম দিকে জাপানের একরূপ চারদিকেই শত্রু ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন, গ্রেট বৃটেন

---

* It was not an ABCD (including China) but an ABDF coalition : American, British, Dutch, French.—The Great Offensive—by Max Werner, Page 164.

এবং হল্যাণ্ড এই কয়েক শক্তিকে নিয়ে যদি তখন জাপানের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা হ'ত তবে হয়তো সে এই সম্প্রসারণের সুযোগ পেত না। কিন্তু তা না করবার ফলে জার্মানীর ন্যায় জাপানও ক্রমশ বাহুবিস্তারের সুযোগ পেয়ে যায়। য়ুরোপে সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দিয়ে মিউনিক চুক্তির দ্বারা অ্যাক্সিস পক্ষকে তোয়াজ করতে গিয়ে যে অবস্থা দাঁড়ায়, এসিয়ায়ও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ হাত গুটিয়ে থাকায় জাপান চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সুবিধে পায় এবং তারপর সুযোগ বুঝে সে ইঙ্গ-মার্কিন-ওলন্দাজ শক্তিকেও আঘাত করে। বিপদে প'ড়ে তারা তখন চীনকেও দলে টেনে নেয়। কিন্তু তাতে জাপানের আঘাত থেকে তাদের অব্যাহতি মেলেনি। জার্মানীর ন্যায় জাপানও একে একে তার শত্রুকে পরাজিত করবার সুবিধে পায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পরাজয়ের আর এক কারণ, উক্ত এলাকায় তাদের অপ্রতুল সমরায়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ঘাঁটিগুলো রক্ষার সুব্যবস্থা না করায়ই তাদের এই বিপদ ঘটে। এমন কি প্রচুর অর্থব্যয়ে সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি স্থাপন ক'রেও তা রক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল না। কেবল নৌবলের চিন্তাই তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল ; কাজেই স্থলসেনা ও বিমানবল বাড়াবার কথা তারা ভালোভাবে ভেবেই দেখেনি। জাপানী আক্রমণ যখন আসন্ন তখনও পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও মার্কিন গোরা সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষের বেশী ছিল কি না সন্দেহ। অত বড় বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্যে মিত্রপক্ষের মাত্র শ' কয়েক আধুনিক বিমান ছিল। অথচ কাগজেপত্রে অস্ত্রশস্ত্রের খুব বড় বড় হিসেব প্রকাশ করা হ'ত। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সমরায়োজন সম্বন্ধেও লোকের মনে ঠিক এমনই ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল ; কার্যত জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সের সমরায়োজন ছিল অত্যন্ত কম।

তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের তৃতীয় কারণ হ'ল জাপবিরোধী দলগঠনে যথার্থ সমরপরিকল্পনার অভাব। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং দৃঢ় আত্মরক্ষাত্মক দু'ভাবে যুদ্ধ চালাবারই সুযোগ ছিল। ভৌগোলিক বিচারে জাপানের চেয়ে তার প্রতিপক্ষদেরই সুবিধে ছিল বেশী। জাপানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাবার অনুকূল ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ তার সদ্ব্যবহার করেনি। এল্যুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন, হংকং ও গুয়ামকে ভিত্তি ক'রে জাপানের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল। তদুদ্দেশ্যে সময় থাকতে প্রস্তুত হ'লে জাপানের নিকটবর্তী এই ঘাঁটিগুলোকে ভিত্তি ক'রে মিত্রপক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে জাপানীদের সম্প্রসারণ রোধ, চীন সাগরের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য লাভ, ফরমোসা এবং হক্কাইডোর ওপর চাপ এবং জাপানী দ্বীপপুঞ্জের ওপর প্রবল-ভাবে বিমানহানা দেবার সুযোগ পেত। তারপর যদি আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে যুদ্ধ চালাবার পরিকল্পনা করা হ'ত তাহ'লে সিঙ্গাপুর ঘাঁটিকে কেন্দ্র ক'রে ভালোভাবেই যুদ্ধ করা চলত। এমন কি ফিলিপিন, গুয়াম এবং হংকং হাতছাড়া হ'লেও সিঙ্গাপুর থেকে ভালোভাবে যুদ্ধ চালাবার আয়োজন করলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানী সম্প্রসারণ রোধ করা সম্ভব হ'ত; মালয় এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা করা চলত এবং ভারত মহাসাগরে জাপানীদের প্রবেশপথও উন্মুক্ত হ'ত না। কিন্তু আসলে কি আক্রমণাত্মক কি আত্মরক্ষাত্মক কোন সুষ্ঠু সমরপরিকল্পনাই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে সেখানে করা হয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষ প্রধানত অবরোধনীতি ও নৌযুদ্ধের নীতির ওপর নির্ভর ক'রে জাপানীদের বাধা দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু কার্যত সেভাবে যুদ্ধ হয়নি। যুদ্ধটা হয়েছে সেখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। যুদ্ধের যথার্থ কোন পরিকল্পনা করতে হ'লে শক্তি সংহত করতে হয়, প্রতিপক্ষকে পাণ্টা ঘা দেবার চেষ্টা থাকা আবশ্যক এবং বাধা

দানের জন্যে কয়েকটি প্রধান স্থান বেছে নেওয়া দরকার। এসব দিক বিচার করলে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের কোন সমরপরিকল্পনা ছিল না বললেই চলে।*

পক্ষান্তরে দেখা যায়, জাপানীরা অত্যন্ত তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায় এবং সমস্ত যুদ্ধটাই ছিল তাদের পরিকল্পিত। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সমরনীতির সম্পূর্ণ সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। আগেই বলেছি, তারা মূল এসিয়াখণ্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগর এই দু' এলাকায়ই আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেজন্যেই তারা মহাদেশিক এবং সামুদ্রিক এই দু' নীতির সমন্বয়ে সমরনীতি নির্ধারণ করে এবং তদনুসারে জাপানীরা এক দিকে মূল এসিয়াখণ্ড এবং অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখল করতে থাকে। কাজেই তাদের সমরনীতি কেবল নৌনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়। জাপানীদের সমরপরিচালনায় প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:—

(১) জাপানী বাহিনী এককভাবে নিয়োজিত হয়, অর্থাৎ জাপান তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী একসঙ্গে নিয়োজিত করে এবং এই তিন বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। জাপানের স্থলসেনা এবং নৌসেনা সমভাবে গড়ে ওঠে। প্রশান্ত মহাসাগরে যখন যুদ্ধ বাধে অন্তত তখন পর্যন্ত স্থলসেনা এবং নৌসেনার সমবেত শক্তি ধরলে জাপান জগতে শীর্ষস্থানীয় ছিল; কোন দেশ হয়ত তার চেয়ে নৌবলে বেশী শক্তিশালী ছিল, আবার কোন দেশের হয়ত স্থলসেনা জাপানের স্থলসেনার চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল; কিন্তু জাপানের মতো স্থলসেনা ও নৌসেনার সমাবেশ আর

* Above all, they (Allies) had no war plan aimed at and adapted to thwarting the Japanese war plan. Japan's methods of conducting war were completely misunderstood by the military leadership of the Allies.—The Great Offensive—by Max Werner, Page—165.

কোনো দেশেরই ছিল না। এই সত্যটি উপলব্ধি না করলে জাপানের শক্তির যথার্থ পরিমাপ করা যায় না। বলা বাহুল্য, জাপানী বিমানবাহিনীর স্বতন্ত্র কোন সত্ত্বা নেই, নৌ ও স্থলবাহিনীতে তা বিভক্ত এবং এই দু' বাহিনীকে সাহায্য করাই জাপানী বিমানবাহিনীর প্রধান কাজ। জাপানের সেনাপতিরা এক বাহিনীর সাহায্যে কোথাও আক্রমণ চালাবার কথা চিন্তা করেন না; তাঁরা সর্বদাই স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীর সমবেত শক্তির কথাই ভাবেন। তারপর ব্যক্তিগতভাবে জাপানী সৈন্যরা সকল অবস্থায়ই লড়তে সক্ষম; অবস্থার সঙ্গে তারা সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং যুদ্ধব্যাপারে কোন সনাতনী ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার মনোভাবও তাদের মধ্যে কম। জাপানী নৌবাহিনী অনেকক্ষেত্রেই কোন স্থান দখলের কালে 'ভাসমান' গোলন্দাজ বাহিনীর কাজ করেছে। সৈন্যবাহী জাহাজ রক্ষা এবং সৈন্যদের ভূতলে অবতরণকালে সাহায্য করাই দেখা যায় জাপানী নৌবাহিনীর প্রধান কাজ। স্থলসেনার কোন কোন অংশ অনেক সময় নৌবহরের ঘাঁটিদখলের জন্যে নৌসেনার কাজ করেছে। এভাবে জাপানী নৌবাহিনী স্থলসেনার কাজ করে এবং স্থলসেনা নৌবাহিনীর জন্যে ঘাঁটি দখল ক'রে দেয় এবং এই পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর ক'রেই তারা দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন বাহিনীর এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাই জাপানী সমরনীতির মূল ভিত্তি।

(২) জাপানী স্ট্র্যাটেজির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সামুদ্রিক "ব্লিৎসক্রীগ"। স্থলযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধকে একত্র মিলিয়ে তার এই সমরনীতি গড়ে উঠেছে। সাগর পাড়ি দিয়ে দূরবর্তী দ্বীপে গিয়ে দ্রুত অবতরণের কৌশলটা সে ভালো-ভাবেই আয়ত্ত করেছে। এর সঙ্গে হিটলারের নরওয়ে-অভিযানের খানিকটা মিল দেখা যায়; কিন্তু জাপানের এই অভিযান চলে এক বিশাল মহাসাগর বক্ষে; কাজেই জাপানের সামুদ্রিক "ব্লিৎসক্রীগের" গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থলযুদ্ধে জার্মান সেনা জাপানী সেনা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু

সম্মিলিত নৌযুদ্ধে জাপানী বাহিনী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা অতুলনীয়। তারা কেবল নৌযুদ্ধের জন্যেই নৌযুদ্ধ করেনি; সামুদ্রিক সম্প্রসারণে তারা নৌবল নিয়োজিত করেছে। নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমাবেশে তারা দ্রুত গতিশীল নৌ-অভিযান চালিয়েছে। জাপানের সম্মিলিত বাহিনী সামুদ্রিক এলাকায় যেরূপ দ্রুত কাজ করেছে, এমন কি হিটলারের যান্ত্রিক বাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে তা পারেনি।

(২) জাপান চূড়ান্ত ঘা দিয়েছে তার স্থলসেনা ও বিমানবলের সাহায্যে। এখানেই মিত্রপক্ষের জাপানকে বুঝতে ভুল হয়েছিল; তারা ভেবেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে উভয়পক্ষে বড় রকমের নৌযুদ্ধ হবে এবং তারই ওপর সেখানকার জয়পরাজয় নির্ভর করবে।* কিন্তু কেবল নৌনীতির ওপর নির্ভর ক'রে জাপানের সমরনায়কগণ প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালাননি। কার্যত জাপানের নৌবাহিনী তার স্থলসেনা ও বিমানবাহিনীর কাজ এগিয়ে দিয়েছে। আগেও বলেছি যে, জাপানী নৌবাহিনীর প্রধান কাজ দেখা গেছে—সৈন্য-বাহী জাহাজগুলোকে রক্ষা করা এবং স্থলসৈন্যদের অবতরণে সাহায্য করা। যতদূর সম্ভব জাপান বড় রকমের নৌযুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করেছে। সমুদ্রবক্ষে জাপান বিশাল এলাকা দখল করেছে, কিন্তু কোন জাপানী ব্যাটল্‌শিপ থেকে এপর্যন্ত কোন মার্কিন ব্যাটল্‌শিপের ওপর একটিও গোলাবর্ষিত হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরে যেসব জাহাজডুবি হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে বিমান-আক্রমণে। কেবল সমুদ্রে টহল দিয়ে জাপানী নৌবাহিনী সমুদ্রবক্ষে তথাকথিত আধিপত্য লাভের চেষ্টা করেনি। একমাত্র মিডওয়ে দ্বীপে আক্রমণ করা ছাড়া মধ্য প্রশান্ত

* "The United States and Britain saw the world through marine glasses that did not reach to the shores. Tokyo, its big Navy not withstanding, contemplates the Pacific area through field glasses." *Alexander Kiralfy.*

মহাসাগরে জাপানী নৌবাহিনী মার্কিন নৌবাহিনীর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করবার জন্যে সম্মুখসমরে কোথাও অবতীর্ণ হয়নি। দ্বীপবাসী জাপানীদের নৌমনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু তা ব'লে তারা কেবল নৌবলের গর্বেই মেতে রয়নি ; নৌযুদ্ধে জাপানের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও স্থলসেনা এবং বিমানবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে তার নৌবাহিনী কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেনি। নৌবাহিনীর সহায়তায় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা দখল করে জাপানের স্থলসেনা ও বিমানবাহিনী।

অথচ সামরিক বিচারে জাপানের নৌবল প্রথম শ্রেণী এবং স্থলসেনা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানী স্থলসেনার আশাতীত সাফল্য দেখে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, তারা হিটলারের জার্মান বাহিনী বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লালফৌজের সমকক্ষ। সমরায়োজনে মিত্রপক্ষ সুদূর প্রাচ্যে অসম্ভব দুর্বল ছিল ব'লেই জাপানীরা এত সহজে জয়লাভে সক্ষম হয়। সোভিয়েট রণাঙ্গনে বা উত্তর আফ্রিকায় যেরূপ আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ হয়েছে, সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীর এলাকায় তেমন যুদ্ধ একটি স্থানেও হয়নি। প্রতিপক্ষের অপ্রস্তুতি ও দুর্বলতার কথা ভালোভাবে জানতো বলেই জাপান অপেক্ষাকৃত কম বল নিয়েও এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখলে অগ্রসর হয়। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান চার লক্ষ সৈন্য এবং তিন হাজারের বেশী বিমান নিয়োজিত করেছিল কিনা সন্দেহ। অথচ জার্মানীকে প্রত্যেক বড় যুদ্ধেই এতদপেক্ষা বেশী সৈন্য ও বিমান নিয়োজিত করতে হয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে সমকক্ষ কোন শক্তির সঙ্গে লড়তে গেলে জাপানীরা দাঁড়াতে পারবে কিনা তার পরীক্ষা আজও হয়নি।

পার্ল পোতাশ্রয়ে জাপানী বিমানহানাকে একটা আকস্মিক ঘটনা ব'লে ধরে নেওয়া চলে না ; জাপানের সমগ্র সমরপরিকল্পনার তা' একটা অঙ্গ। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রে হানা দিয়ে তার নৌবল ও বিমানবল ধ্বংস বা অন্তত সাময়িকভাবে অকর্মণ্য করাই ছিল জাপানের

উদ্দেশ্য। পার্ল পোতাশ্রয়ে হানা দিয়ে তার সেই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হয় এবং তাতেই খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে সে ফিলিপিন ও মালয়ে অভিযান চালাতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তার আসল লক্ষ্য ছিল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর ঘাঁটি দখলের জন্যে জাপান বহুদিন আগে থেকেই চেষ্টা ক'রে আসছিল।

এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলা দরকার, নৌশক্তি সম্বন্ধে চিরাচরিত চিন্তাধারায় জাপান বিষম ঘা দিয়েছে। নৌযুদ্ধে পরাজিত না হয়েও প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের পরাজয় হয়েছে এবং নৌযুদ্ধে না জিতেও জাপানীরা সেখানে জয়লাভ করতে পেরেছে। নৌবলে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীদের যুদ্ধজয় করতে অসুবিধে হয়নি। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভেবেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ বাধলে সেই যুদ্ধ প্রধানত জলেই হবে এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা জাপানের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, নৌযুদ্ধের ফলাফলের দ্বারাই চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে; কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রশান্ত মহাসাগরে নৌযুদ্ধ কার্যত ভিন্ন রূপ নেয়। যথার্থ নৌযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় প্রশান্ত মহাসাগরে তা হয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের ফলাফল ব্যাটল্‌শিপের সঙ্গে ব্যাটল্‌শিপের লড়াই দ্বারা নির্ণীত না হয়ে হয়েছে অন্যভাবে।

মার্কিন নৌবহর যাতে প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে স্বাধীনভাবে বেশীদূর বিচরণ করতে না পারে জাপানীরা প্রথমেই তার চেষ্টা করে; ক্রমশই মার্কিন নৌবহরের বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে মার্কিন নৌবহর কার্যত বিশেষ কিছু করবার সুবিধে পায়নি। সেখানেও জাপানীরা বোমা ফেলে। তার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যেখানে যথার্থ যুদ্ধ চলে তার দু'হাজার মাইলের মধ্যেও

মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো আসবার সুযোগ পায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় জাপানী নৌবহর একরূপ একচেটে ব্যবস্থা করে নেয়। অবশ্য মিত্রপক্ষের কোন যুদ্ধজাহাজই সেখানে ছিল না এমন নয়; কিন্তু মার্কিন নৌবহরের প্রধান শক্তিকেই জাপানীরা আসল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মিত্রপক্ষ ঘাঁটিগুলো হারাবার ফলেই মার্কিন নৌবহরের গতিবিধি এভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসিয়াটিক নৌবহরের ভূতপূর্ব অধিনায়ক অ্যাডমিরাল হার্ট ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ এসম্পর্কে বলেন :—

"নিরাপদ ঘাঁটি পেলেই নৌবল একমাত্র কার্যকরী হতে পারে। সেইরূপ ঘাঁটিসমূহ হারাবার ফলেই প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।"

এদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, নিছক নৌনীতির ওপর নির্ভরশীল মিত্রপক্ষের স্ট্র্যাটেজির চেয়ে নৌবাহিনীর সহায়তায় দ্বীপদখলের জন্যে স্থলসেনা প্রেরণের জাপানী স্ট্র্যাটেজিই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় অধিকতর কার্যকরী হয়েছে।

কোন্ পক্ষের কত জাহাজ ডুবেছে তা' দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌযুদ্ধের গুরুত্ব ঠিক পরিমাপ করা যায় না; ঘাঁটি দখল করা এবং লক্ষ্যস্থলে জাপানীদের উপনীত হতে পারা না পারা দিয়েই তার গুরুত্বের যথার্থ পরিমাপ হতে পারে; কারণ ঘাঁটি এবং দেশ দখল করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য; মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলোকে সাগরগর্ভে প্রেরণের দিকে তাদের প্রধানত দৃষ্টি ছিল না।

অতএব দেখা যায়, বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলো নৌযুদ্ধের ওপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের জয়পরাজয় একান্তভাবে নির্ভর করে না; এমন কি বিমানবলের সাহায্যে নৌযুদ্ধ চালালেও তদ্দ্বারা চূড়ান্ত ফললাভ করা সেখানে অসম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানকে পরাজিত করতে হ'লে নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমবায়ে মিত্রপক্ষকে হৃত ঘাঁটিসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্যে লড়তে হবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে গুয়াদালকানার, বুনা-গোনা এবং মুণ্ডার যুদ্ধে মিত্রপক্ষ তিন বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পরিচয় দেয়। জাপানীরা যে-কৌশলে দ্বীপসমূহ দখল করেছিল মিত্রপক্ষের সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারও সেই কৌশলই অবলম্বন করেন। তাছাড়া উক্ত এলাকায় মিত্রপক্ষের বিমানবলেও প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হ'লে মিত্রপক্ষের দিক থেকে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে দ্বীপদখলের নীতি অবলম্বন করলে চলবে ব'লে মনে হয় না। জাপানের সরবরাহপথ যতদিন নিরাপদ থাকবে ততদিন সেও উক্ত এলাকায় শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং তাতে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান শীঘ্র করতে হ'লে সর্বাগ্রে জাপানীদের সুদীর্ঘ সরবরাহপথে ব্যাপক আক্রমণ চালানো একান্ত আবশ্যক। তিনভাবে এই আক্রমণ চালানো সম্ভব : (১) স্থলঘাঁটি থেকে বিমানহানা ; (২) বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিমান-হানা ; এবং (৩) অবাধ সাবমেরিণ-আক্রমণ। স্থলঘাঁটি থেকে জাপানীদের সরবরাহপথে আক্রমণ করতে হ'লে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী মূল এসিয়াখণ্ডের ঘাঁটিগুলো পুনরুদ্ধার এবং চীনে প্রচুর বিমানবল ও সমরোপ-করণ প্রেরণ করা দরকার। আর বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিমানহানা এবং সাবমেরিণ-আক্রমণ চালাতে হ'লে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘাঁটিগুলো ফিরে দখল করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ জাপান যেমন যুগপৎ মূল এসিয়াখণ্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা করেছিল, মিত্রপক্ষেরও ঠিক তেমনই সমরপরিকল্পনা করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের প্রারম্ভে মিত্রপক্ষের যথেষ্ট ঘাঁটি ছিল, কিন্তু বিমানবল তেমন ছিল না ; ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের বিমানবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদের এখন উপযুক্ত ঘাঁটির অভাব। কেবল নৌবল ও বিমানবলের সাহায্যে ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় ; সেজন্যে দরকার যথেষ্ট স্থলসেনার। এই স্থলসেনার সমাবেশক্ষেত্র হিসেবেই আজ অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, এলাস্কা এবং এল্যুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের

সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মূল এসিয়ার পূর্ব প্রান্তিক ঘাঁটিগুলো পুনরুদ্ধার এবং চীনের সঙ্গে স্থলপথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হ'লে মিত্রপক্ষের পুনরায় ব্রহ্মদেশ দখল করতেই হবে এবং ব্রহ্মদেশের অভিযান ভারতবর্ষ থেকে চালানো ছাড়া উপায় নেই। কাজেই সামরিক বিচারে ভারতবর্ষের অবস্থান আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেকখানি তার ওপর নির্ভর করছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অবস্থায় জাপান আর এখন নেই। সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে সেখানে সে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। জনবল ও অর্থনৈতিক শক্তি তার যথেষ্ট বেড়েছে। অতএব জাপানকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হ'লে মিত্রপক্ষের আজ প্রচুর সামরিক বল নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কেবল সামরিক বল থাকলেই চলবে না, তার সঙ্গে সুষ্ঠু সমরপরিকল্পনা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকা চাই। নিছক সামরিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে আধুনিক সার্বিক যুদ্ধ চলে না। "গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজি" নিরূপণে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ দূরদৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

মহাযুদ্ধের নতুন পর্ব

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বিদ্যুৎগতিতে সম্প্রসারণের পর জাপান বৎসরাধিক কাল যাবৎ আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ এবং সাইবিরিয়ার ওপর প্রত্যক্ষ চাপ পড়া সত্ত্বেও জাপান তার কোনটিই আক্রমণ করেনি; কেবল মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তিক এলাকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় জাপানী বিমানসমূহ মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে। চীনের যুদ্ধেও গত দেড় বছরের মধ্যে জাপানীরা যে খুব বেশী জোর দিয়েছে এমন নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নিউগিনি এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটিগুলোতে শক্তি বৃদ্ধি করবার চেষ্টা ছাড়া সেদিকেও জাপানের তেমন কোন আক্রমণের নবোদ্যম পরিলক্ষিত হয়নি। উক্ত এলাকায় যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোই জাপানীদের ঘাঁটিরক্ষার ব্যাপার নিয়ে ঘটেছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উক্ত এলাকায় যুদ্ধচালনায় যেটুকু নতুনত্ব দেখা গিয়েছে তা হ'ল এই যে, সেখানে জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতেই কেবল তারা বাধা দেয়নি, পরন্তু কোন কোন ঘাঁটি থেকে জাপানীদের তাড়াবার চেষ্টাও তারা করেছে। কাজেই সেখানে জাপানীদের হাত থেকে আক্রমণোদ্যম অনেকটা মিত্র পক্ষেরই হাতে চ'লে এসেছে আপাতদৃষ্টিতে একথা বলা চলে।

ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বের সামরিক অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের পূর্ণ বিজয়লাভ এবং য়ুরোপে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানবাহিনীর ব্যাপক হানা এই যুদ্ধে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আফ্রিকার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই ইতালীয়দের মনোবল যে বহুলাংশে ভেঙ্গে পড়ে, মিত্রপক্ষের সিসিলি-অভিযানে সাফল্য এবং মুসোলিনী ও তাঁর ফাসিস্ত দলের পতনের দ্বারাই তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য,

ইতালীতে ফাসিস্তবাদের জন্মদাতা সিনর মুসোলিনীর পতন ও তাঁর দলের অবসান হওয়ায় ফাসিস্তবাদের মূল ধ'রে টান পড়ে ; কেননা এই ঘটনার পর ফাসিস্ত ইতালীর রাজসংস্করণ নাৎসী জার্মানীর অধিবাসীদের মনে এই প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, ফাসিস্তবাদ সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত কিনা এবং ফাসিস্ত ডিক্টেটরতন্ত্রের অধীনে কোন জাতি সত্যিই তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম কিনা ? সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়াও খুবই স্বাভাভাবিক যে, সমাজবিবর্তনের গতিপথে ফাসিস্তবাদের আর কোনো সার্থকতা আছে কিনা ? পুঁজিবাদ ক্রমশ স্ফীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ-সংঘাতে যখন পুঁজিবাদের ভিত্তি শিথিল হয়ে ওঠে তখনই সাম্রাজ্যবাদ উগ্র হয়ে ফাসিস্তবাদ রূপে দেখা দেয় ; ফাসিস্তবাদ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে সাম্রাজ্যবাদে যখন ক্ষয় ধরলো এবং সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা যখন সমাজতন্ত্রের রূপ ধরে পুঁজিবাদীদের সম্মুখে বিভীষিকার ন্যায় এসে দাঁড়াল, তখনই সাম্রাজ্যবাদ আত্মরক্ষার একটা নতুন পথ খুঁজতে লাগলো। সেই পথই ফাসিস্ত ও নাৎসীবাদ। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এটা তেমন ভাবে প্রকট হয়ে না ওঠবার কারণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সাম্রাজ্যিক সংস্থা। কিন্তু এ দুটোর অভাব যাদের রয়েছে তারাই সাম্রাজ্যবিস্তারের নতুন পথ খোঁজে এবং ফাসিস্তবাদই সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সহজতম পন্থা ব'লে তারা মনে করে। কায়েম সাম্রাজ্যবাদীদের পথে গিয়ে নতুন সাম্রাজ্যবাদীরা যে সুবিধে ক'রে উঠতে পারবে না এটা বুঝতে পেরেই তথাকথিত গণতন্ত্রের দিকে না গিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিকে যুদ্ধমুখীন ক'রে তোলবার জন্যে তারা ডিক্টেটরতন্ত্রের প্রবর্তন করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ডিক্টেটরতন্ত্রের সাফল্য দেখে ফাসিস্ত ও নাৎসী নায়করা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্রুত দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি ও সমস্ত শক্তি সংহত করতে

হ'লে সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রীদের পন্থা অনুসরণ না ক'রে ডিক্টেটরতন্ত্রের আশ্রয় নেওয়াই সুবিধেজনক বলা বাহুল্য, অল্পকালের মধ্যে প্রচুর শক্তি অর্জনে ফাসিস্ত ডিক্টেটরতন্ত্র সক্ষম হয়; কিন্তু এই শক্তি অর্জনের মূলে সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সা থাকায় তার মধ্যে এক বিরুদ্ধ শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই বিরুদ্ধ শক্তি ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং ইতালীতে মুসোলিনী ও তাঁর ফাসিস্ত দলের পতন তারই অনিবার্য পরিণতি। যে-কারণে মুসোলিনীর পতন ঘটেছে, সেই কারণেই হিটলারের আকস্মিক পতনের খবরও যে-কোন দিন পাওয়া কিছু অসম্ভব নয়। অতএব সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বহারাদের ডিক্টেটরতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) আর ফাসিস্ত ডিক্টেটরতন্ত্র এক ফল প্রসব করতে পারে না।

সর্বহারাদের ডিক্টেটরতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় শক্তিকে ক্রমশ শিথিল ক'রে গণশক্তিতে তা পরিব্যাপ্ত করা; আর ফাসিস্ত ডিক্টেটরতন্ত্রের মূল লক্ষ্য গণশক্তিকে সঙ্কুচিত ক'রে কেন্দ্রীয়শক্তিতে তা সংহত করা। কাজেই পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও যেটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে ফাসিস্ত রাষ্ট্রে তাও নেই। রাষ্ট্র সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করে। কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে ফাসিস্ত রাষ্ট্রের জনগণ দীর্ঘকাল থাকতে পারে না; সেই বন্ধনদশা থেকে মুক্তির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগতে বাধ্য এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে বিদ্রোহরূপে দেখা দেবে।

সুতরাং যে-দ্বন্দ্বের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে, ফাসিস্তবাদের মধ্যেও সেই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ফাসিস্তবাদের অন্তর্নিহিত এই দ্বন্দ্ব যতই প্রকট হয়ে উঠবে, ফাসিস্ত দেশগুলোতে ফাসিস্ত-বাদের প্রতি লোকের বিশ্বাসও ততই শিথিল হয়ে আসবে।

ইতালীতে ইতিমধ্যে তা ঘটেছে এবং অন্যান্য ফাসিস্ত দেশেও, আজ হোক কাল হোক, তার পুনরাবৃত্তি হবে বলেই মনে হয়। কেবল তাই নয়,

ফাসিস্ত আদর্শে আস্থা হারিয়ে লোক নিশ্চয়ই জরাজীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে না। বিশেষ ক'রে যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠনের প্রশ্ন যখন উঠবে তখনই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের একটা তুলনামূলক বিচার চলবে। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ। গত মহা-যুদ্ধের পর যে-সকল অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর শাসকগণ গলদঘর্ম হয়েছেন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা সমাজতান্ত্রিক পন্থায় গিয়ে অনায়াসেই সেইসব সমস্যার সমাধান করেছেন। কাজেই পুনর্গঠনের সময় যুদ্ধক্লান্ত দেশগুলোর অধিবাসীরা সমাজতন্ত্রবাদের দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়বে এমন আশা করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সংঘর্ষ আবার প্রত্যক্ষভাবে দেখা দেবে; কিন্তু ফাসিস্তবাদের অবসান হবার ফলে সমাজতন্ত্রবাদ তখন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং নবশক্তিসম্পন্ন সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে জরাজীর্ণ সাম্রাজ্যবাদ সংঘর্ষে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। এটা নিছক ভাবাবেগ বা আদর্শবাদের কথা নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন স্বীকার করতে হ'লে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের ফলাফলেও আজ এটাই সূচিত হচ্ছে।

এত কথা বলতে হ'ল এ জন্যে যে, য়ুরোপের যুদ্ধের ফলাফলের ওপর এসিয়া মহাদেশের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। য়ুরোপের নাৎসী-বাহিনীর পতন হ'লে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগ দেওয়া কিছু অসম্ভব নয়; অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি য়ুরোপের রাজনৈতিক ব্যাপারে যে মনোভাব ও নীতি অবলম্বন করবে তার ওপর জাপান সম্বন্ধে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনেকখানি নির্ভরশীল হবে। পশ্চিমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অভ্যুত্থান হ'লে সোভিয়েট শক্তি পূর্বদিকে জাপানের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কিনা সন্দেহ। সোভিয়েট শক্তি

জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হ'লে অন্তত বর্তমান অবস্থায় চীনেরও সংগ্রামশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। একমাত্র ব্রহ্মদেশ মিত্রপক্ষ ফিরে দখল ক'রে যদি চীনের সরবরাহপথ পুনরায় উন্মুক্ত করতে পারে তবেই মিত্রপক্ষের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে চীনের সংগ্রামশক্তি কিছু বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব; কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দ্বীপপুঞ্জ এবং এদিকে মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি চীনকে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারবে বলা যায় না। অথচ মূল জাপানের ওপর আক্রমণ চালাতে হ'লে চীন ও সাইবিরিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলো মিত্রপক্ষের হাতে পাওয়া একান্ত আবশ্যক। চীনের বিপুল সৈন্য-দলের হাতে যথোপযুক্ত অস্ত্র তুলে দিতে পারলে এবং সুদূর প্রাচ্যস্থিত সোভিয়েট নৌবহরকে স্বপক্ষে পেলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির জয়লাভ করা অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ নাও হতে পারে; কেবল য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবসানই কথা নয়, সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কূটনৈতিক চালের ওপরও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে সোভিয়েট শক্তির যোগ দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করছে।

মস্কো সম্মেলন

সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ভাগ্যবিপর্যয় ও লালফৌজের বিজয়-অভিযান সুরু হবার পরই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাকা যে কোন্ দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, মস্কোতে ত্রিশক্তি সম্মেলনের ফলাফলের দিকে তাকালেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। যারা আজও মনে করেন যে, এই যুদ্ধে কেবল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিরই জয় হচ্ছে এবং যুদ্ধান্তে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদ আরো ভালোভাবে কায়েম হয়ে বসবে, মস্কো-সম্মেলনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, এই যুদ্ধের গতি তাঁদের চিন্তাধারার বিপরীতগামী। আগের কয়েক অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে, রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেবার পর থেকে এ যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট-শক্তি শত চেষ্টা ক'রেও বৃটেন ও ফ্রান্সকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি, সোভিয়েট শক্তির নামে যে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেলে-আগুনে জ্বলে উঠত, অবস্থার চাপে পড়ে সেই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে সদলবলে মস্কোতে ছুটে যান। ফ্রান্সের আগের অবস্থা থাকলে তার পররাষ্ট্র সচিবকেও হয়তো এমনই ভাবে মস্কো ছুটতে হ'ত। অথচ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মস্কো-আলোচনার সময় বৃটেন ও ফ্রান্সের তৎকালীন শাসকগণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কত টালবাহনাই না করেছিলেন। সেদিন পুঁজিতন্ত্রী দেশের শাসকগণ স্বেচ্ছায় যা করেননি, আজ অবস্থার চাপে প'ড়ে বাধ্য হ'য়ে তাঁদের তা করতে হচ্ছে। যুদ্ধের আবর্তে প'ড়ে গত কয়েক বছরের মধ্যে জগতের এমন রূপান্তর ঘটেছে যে, সমাজতন্ত্রের দুর্বার গতিকে পুঁজিতন্ত্রীরাও আর অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারছে না; তাই তারা আজ সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে আপোষ করবার

জন্যে ব্যাগ্র এবং গত অক্টোবর মাসের মস্কো-সম্মেলন তারই পরিণতি। আগেও বলেছি, সমাজতন্ত্রবাদ ঐতিহাসিক ধারার একটা স্বাভাবিক ক্রম ; বুর্জোয়াতন্ত্র সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস ক'রে যেমন মানব সভ্যতাকে এক উন্নত স্তরে টেনে এনেছিল, সমাজতন্ত্রও বুর্জোয়াতন্ত্রকে ধ্বংস ক'রে মানব সভ্যতাকে তেমনই আর এক উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট শক্তির জয়ের মধ্যে এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে বিশ্ববিপ্লব যে ক্রমশ মূর্তি পরিগ্রহ করছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে তা সহজেই প্রত্যক্ষ হয়। পুঁজিতন্ত্র বিরোধিতাই করুক আর আপোষই করুক, সমাজতন্ত্রের কাছে যে ক্রমশ তাকে নতি স্বীকার করতে হবে, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাস করলে তা স্বীকার করতেই হয় এবং মস্কোর সঙ্গে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সৌহার্দ্য স্থাপনের ব্যগ্রতা তারই সাক্ষ্য দেয়।

অতএব মস্কো-সম্মেলনকে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখাই বোধ হয় সঙ্গত হবে যে, ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিতন্ত্রীদের কাছে এটা সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট শক্তির আত্মসমর্পণ বা আপোষের প্রস্তাব নয়, সোভিয়েট শক্তির সঙ্গেই বরঞ্চ পুঁজি-তন্ত্রীদের এটা আপোষের চেষ্টা। নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি হয়েছিল ব'লেই সোভিয়েট শক্তি যেমন তার মতবাদ বিসর্জন দেয়নি, তেমনই বাস্তব প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হ'লেই যে সোভিয়েট শক্তি তার আদর্শ ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে এমন মনে করবারও কোনো কারণ নেই। মার্ক্সবাদী মার্শাল স্ট্যালিন বাস্তবকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না ; তাই মুখ্য শত্রু ফাসিস্ত শক্তিকে দমন করবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হননি। মার্ক্সবাদী ও বুর্জোয়াতন্ত্রীদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুঁজিতন্ত্রী দেশসমূহের শাসকগণ একদিন ভ্রান্ত মর্যাদাবোধের বশবর্তী হয়ে সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন,

পরে ঘটনাচক্রে যখন সেই সব পুঁজিতন্ত্রী দেশেরই শাসকগণ সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়ালেন, মার্শাল স্ট্যালিন তখন কোন ভ্রান্ত মর্যাদাবোধের বশবর্তী না হয়ে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। এটাই তাঁর বাস্তববোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মস্কো-সম্মেলনের যেটুকু ফলাফল জানা গিয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিচার ক'রে দেখলে তাতেও এই বাস্তববোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান মহাযুদ্ধকে যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করবার জন্যে মস্কো-সম্মেলনে যে সামরিক সিদ্ধান্ত হয় তা জানা যায়নি বা জানা সম্ভবও নয়; কেননা তা সামরিক গুপ্তখবর। রাজনৈতিক বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে কেবল তারই খানিকটা জানা গিয়েছে। সাধারণ পরিস্থিতি ও যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থা সম্পর্কে যে সাতটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে তার চার নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যত শীঘ্র সম্ভব একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান এই ভিত্তিতে গঠিত হবে যে, শান্তিকামী রাষ্ট্রমাত্রেরই তার সদস্য হবার অধিকার থাকবে এবং ছোটই হোক আর বড়ই হোক উক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সকলেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার পাবে।

গত মহাযুদ্ধের পরও রাষ্ট্রসংঘ নামে এমনই এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে প'ড়ে তার শোচনীয় পরিণাম ঘটে। রাষ্ট্রসংঘকে উপলক্ষ ক'রে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থকে আরো কায়েম করতে লেগে যায়; ফাসিস্ত শক্তিগুলোও তখন নিজেদের সুবিধে ক'রে নেবার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ থেকে স'রে পড়ে। কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট শক্তির কথায় কর্ণপাত না ক'রে ফাসিস্ত শক্তিকে বাড়তে দিয়েই এই মহাযুদ্ধকে ডেকে আনে। কিন্তু এবার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়বার সময় মার্শাল স্ট্যালিন নিশ্চয়ই আর সে ভুল হতে দেবেন না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের 'নবেম্বর দিবস' উপলক্ষে মার্শাল স্ট্যালিন মস্কোতে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি মিত্রপক্ষের পাঁচটি কর্তব্য সম্বন্ধে

বিশেষ জোর দিয়ে বলেন : (১) য়ুরোপে জনসাধারণকে হিটলারী কবল থেকে মুক্ত করা ; (২) বিভিন্ন দেশের মুক্ত জনসাধারণকে তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রজীবন সংগঠনের অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া ; (৩) অপরাধী ও অত্যাচারের জন্যে দায়ী ব্যক্তিগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া ; (৪) য়ুরোপে এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যার ফলে নতুন জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হবে ; (৫) যে-সব অঞ্চল ফাসিস্ত জার্মানীর কবলে পর্যুদস্ত সেই সব অঞ্চলের পুনঃসংস্কারের জন্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্থায়ী সহযোগিতা স্থাপন।

জয়ের সুযোগ নিয়ে কোন পরাজিত জাতিকে দাবিয়ে রেখে বিজয়ী পক্ষ নিজের সুবিধে করবার প্রয়াস পেলে তাতে যে আর এক অশান্তিকেই ডেকে আনা হয়, সাম্যবাদী মার্শাল স্ট্যালিন তা জানেন এবং জানেন বলেই প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যাতে রাষ্ট্রসংঘের পথে না যেতে পারে তার জন্যে চেষ্টা করবেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে মনীষী বার্নার্ড শ' এক বিবৃতিতে এ কথাই সমর্থন করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর ভাগ্য কিরূপ হবে? উত্তরে তিনি বলেন :—

"স্ট্যালিন জানেন যে, আগামী বিশ বছর জার্মানীর মাথার ওপর চেপে বসে না থেকে জার্মানীকে সুস্থ শরীরে আবার তার পায়ের ওপর আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। আমরা যখন রণক্ষেত্রে কোন আহত জার্মানকে ধরি তখন তাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই এবং নিজেদের আহত সৈন্যদের জন্যে যতটা যত্ন নিই তার জন্যেও ততটাই যত্ন নিই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পরাজিত জার্মানীর প্রতি যদি আমরা ওরূপ আচরণ করতাম তাহ'লে আবার যুদ্ধ বাধত না এবং হিটলার এখনও পর্যন্ত নিরীহ চিত্রকর বা স্থপতিই থাকতেন। কিন্তু আমরা পদাঘাতে ভূপাতিত জার্মানীর প্রাণবধের চেষ্টা করার সুযোগ

ক্লেমাঁসো[১] ও পোয়ঁ্যাকারেকে[২] দিই। এবার কিন্তু আমাদের কারবার পোয়ঁ্যাকারের সঙ্গে নয়, স্ট্যালিনের সঙ্গে।"

ইতালী সম্বন্ধে মস্কো-সম্মেলনে যে-সকল সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতেও গণশক্তির প্রতি আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এক নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে :—

"ইতালীর যারা সর্বদা ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ক'রে তুলতে হবে।"

তারপর দু'নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে :—"ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করতে হবে।"

এই দু'টি সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, মুসোলিনীর পতনের পর সামরিক প্রয়োজনে ইতালীর বাদোলিও গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রে নিলেও তাকে আর বেশী আস্কারা দেবার ইচ্ছে নেই। ইতালীর গণশক্তির পুনরুত্থানের জন্যে মস্কো-সম্মেলনে সোভিয়েট পক্ষ থেকে যে চাপ পড়ে, ইতালী সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো ভালোভাবে পড়লেই তা বোঝা যায়। যুদ্ধ চলা অবস্থায় ইতালীতে মস্কো-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভার তথাকার মিত্রপক্ষীয় প্রধান সেনাপতির ওপর দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু একটি সর্ত আছে এই যে, সম্মিলিত দলের যেসব

(১) ক্লেমাঁসো ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি অত্যন্ত জার্মানবিদ্বেষী ছিলেন। গত যুদ্ধের পর প্যারিসে যে শান্তি-সম্মেলন হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। জার্মানীর নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং শান্তি-সম্মেলনে অনেক বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়।

(২) পোয়ঁ্যাকারে একাধিকবার ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রিত্ব করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। জার্মানীর কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে তিনিও কম উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরই নির্দেশে ফরাসীরা জার্মানীর রুর অঞ্চল দখল করেছিল।

সেনাধ্যক্ষ থাকবেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তিনি কিছু করতে পারবেন না। এ ছাড়া আরো স্থির হয়েছে যে, মস্কো-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত দ্বারা এমন কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে না যার ফলে ইতালীর সর্ব-সাধারণের কাম্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা বাধা পেতে পারে।

এ থেকে বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় না যে, প্রতিক্রিয়াশীল মার্শাল বাদোলিওকে নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আর বেশী নাচানাচি করতে গেলে মস্কো থেকে তাতে বাধা আসবে। ওয়াশিংটন-সম্মেলন থেকে আরম্ভ ক'রে কুইবেক-সম্মেলন পর্যন্ত চার্চিল-রুজভেল্টএ পরামর্শ হয়েছে, আর মার্শাল স্ট্যালিনকে তা জানানো হয়েছে। কিন্তু লালফৌজের ক্রমাগত বিজয়াভিযান দেখে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আর কেবল মস্কোকে "জানাবার পাট" সেরেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি, রাজনৈতিক বিষয়ে বোঝাপড়ার জন্যে পরামর্শ করতে মস্কোতে ছুটতে হয়েছে। এখানেই মস্কো-সম্মেলনের আসল গুরুত্ব।

মস্কো-সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাতে লক্ষ্য করবার একটা বিষয় এই যে, ইতালীর রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয়েছে, অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বল্টিক থেকে বল্কান পর্যন্ত ছোটবড় রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে খুলে কোন কথা বলা হয়নি। এতে বোঝা যায়, ইতালী বা অস্ট্রিয়ার ব্যাপার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির হাতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যতখানি ছেড়ে দিতে রাজী, বাড়ীর কাছের রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ওপর ততখানি নির্ভর করতে রাজী নন; কেননা ওসব রাষ্ট্রের অনেকগুলো গত মহাযুদ্ধের পর ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি কর্তৃক তাদের নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে গঠিত এবং জাতিগতভাবে রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ না ক'রে অনেকক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সীমা নির্ধারণ করা হয়। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট শক্তি রাষ্ট্রগঠনে এই কৃত্রিমতা মেনে নিতে পারে না; এই জন্যেই হয়তো বল্টিক থেকে

বল্কান পর্যন্ত পূর্ব য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে মস্কো-সম্মেলন নীরব।* এ সম্বন্ধে আরো একটু তলিয়ে দেখলে ভালো হয়। সামরিক প্রয়োজনে মার্শাল বাদোলিওর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেননি, করলে তাতে তাঁদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হ'ত না; কেননা ভূমধ্য-সাগরীয় এলাকায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ওপর সেই অবস্থায় ইতালীর ব্যাপার নিয়ে বেশী চাপ দিতে যাওয়া বাস্তববিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়াত এবং তখন মিত্রপক্ষের মধ্যে কোন ভাবে মতান্তর প্রকাশ পেলে তাতে প্রতিপক্ষের শক্তিবৃদ্ধিই হ'ত। বাদোলিওর ব্যাপারে বাস্তবের দিকে চেয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে যা মেনে নিতে হয়েছে, পূর্ব য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে তাঁদের তা মেনে নেবার প্রয়োজন নেই। নাৎসী জার্মানীর পতন হ'লে ওসব রাষ্ট্রে গণশক্তির অভ্যুত্থান যে আপনাথেকেই হবে একথা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানেন এবং জানেন বলেই তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল পোলিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় দাবী অগ্রাহ্য করেছেন এবং যুগোস্লাভিয়ার বিশ্বাসঘাতক নেতা মিহাইলোভিশের আসল রূপ জগদ্বাসীর সমক্ষে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি রয়টারের এক খবরে বলা হয়, বুলগেরিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব প্রবল যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি বুলগেরিয়ায়

* ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর ওয়াশিংটন থেকে রয়টারের খবরে বলা হয়:—"অদ্য সাংবাদিকদের বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব (ইনি মস্কো-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন) মিঃ কর্ডেল হাল বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, যুদ্ধাবসানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমান্ত সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর সমাধান করা হবে। ইতালী সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলো পূর্ব য়ুরোপেও প্রযোজ্য কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, যে-সব এলাকার সীমানা নিয়ে মতবিরোধ আছে সেগুলো তা থেকে বাদ পড়বে। ওই ধরণের মুক্ত এলাকাসমূহে চূড়ান্ত গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের আগেই এ রকম প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে-সমস্ত প্রশ্নের সমাধান স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছে, কেননা তা না হ'লে যুদ্ধজয়ে দেরী হয়ে যাবে।"

নাসিকা প্রবেশ করাতে চাইলে তারা তাতে বাধা দেবে, কিন্তু লালফৌজ এগিয়ে এলে তারা তাদের বাধা দেবে না।

কেবল বুলগেরিয়া কেন, লালফৌজের বিজয়াভিযান দেখে য়ুরোপের আরো অনেক রাষ্ট্রের গণশক্তিই হয়তো তাদের অভিনন্দন জানাবে। সেই সব রাষ্ট্রে সোভিয়েট লালফৌজের সামরিক অভিযান হয়তো আর প্রয়োজনই হবে না ; বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিপ্লবী গণসেনাই সেদিন তাদের স্ব স্ব দেশের গণস্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দাঁড়াবে এবং সমাজতন্ত্রবাদের বিজয়পথকে সুগম ক'রে তুলবে।

সমরাবর্তে ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে আবর্তন চলেছে ভারতবর্ষকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা চলে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাকে এযুদ্ধে জড়াতে হয়েছে এবং তার ফলাফলও তাকে ভুগতে হচ্ছে। এযুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গেও তার ভাগ্যসূত্র বিজড়িত। কাজেই ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এযুদ্ধের মধ্যে নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারেননি ; বারংবার তাঁদের চিন্তাধারায় ঘাতপ্রতিঘাত এসেছে, কর্তব্যনির্ধারণ নিয়ে মতান্তর ও বাদানুবাদ যথেষ্ট হয়েছে এবং রাজনৈতিক জটিল প্রশ্নগুলো অনেককে বিচলিত ক'রে তুলেছে। এযুদ্ধে ভারতের অবস্থা একটু বিচিত্র—একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ঘাড় চেপে বসে আছে, অপর দিকে ফাসিস্ত জাপান তার দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে কোন জাতির কর্তব্য নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন। এ অবস্থায় প'ড়ে জাতীয় জীবনে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি,

ঐতিহাসিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে দূরদৃষ্টি না থাকলে এই সঙ্কটের সময় পথ নির্ণয় করা সহজ নয় এবং এ সময় বিচারে সামান্য ভুল হ'লে সমগ্র জাতির ভাগ্যে দুঃসহ বোঝা নেমে আসতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার আগে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা বিচার ক'রে যে দু'জন জাতীয় নেতা সব চেয়ে বেশী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু এবং আর একজন হলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। বর্তমান আন্তর্জাতিক ঝড়ের পূর্বাভাষ তাঁরা দু'জনেই দিয়েছিলেন; কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ছিল। দুজন দু'দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক অবস্থা দেখেছিলেন ব'লেই দু'জনের কর্মপন্থাও পৃথক হয়ে যায় এবং তারই জন্যে একজন স্বদেশে থেকে গণশক্তির উত্থানকল্পে আত্মনিয়োগ করা শ্রেয় মনে করেন এবং তার ফলে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের রোষে প'ড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; আর একজন বিদেশী শক্তির সাহায্য পাবার আশায় গোপনে স্বদেশ ত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্র কেবল দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন জরাজীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন সাম্রাজ্যবাদী ফাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থান এবং তিনি মনে করেছিলেন, প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়ে বর্তমান যুগে জগতে ফাসিস্ত শক্তিরই প্রতিষ্ঠা হবে। কাজেই তাঁর মনে এই দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে, ফাসিস্ত শক্তির আক্রমণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়বে; অতএব ফাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থানেই ভারতের মুক্তি আসন্ন। সুভাষচন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মপন্থার মূলে ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। পণ্ডিত জওহরলালও কিন্তু আগাগোড়া একথাই ব'লে এসেছেন যে, পুঁজিতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদে ভাঙ্গন ধরেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠবে; কিন্তু তিনি এই সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ফাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থানের মধ্যে দেখতে পাননি; তিনি দেখতে পান সাম্যবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির মধ্যে। ফাসিস্তবাদের বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁর

সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি ; ভারতের গণমুক্তিকে তিনি বিশ্বব্যাপী গণবিপ্লবের সঙ্গে এক ক'রেই দেখেছেন। এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয়। আপাতদৃষ্টিতে ফাসিস্তবাদ যতই শক্তিশালী হোক, মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ অনুসারে তা যে বেশিদিন টিকতে পারে না, ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক শক্তির কাছে তাকে যে পরাজয় স্বীকার করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদও যে ক্রমশ অসার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে—একথা পণ্ডিত জওহরলাল বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্তেই তিনি বারংবার সাম্যবাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিশ্বের গণশক্তির উত্থানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত এবং ভারতের মুক্তিও যে সেই ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারাকে অবলম্বন ক'রেই আসবে—পণ্ডিত জওহরলাল আগাগোড়া এই সত্য অকুণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। এজন্তেই তাঁর কর্মপন্থা গণমুখী ; স্বদেশের গণশক্তির উত্থানদ্বারাই ভারতের মুক্তিবিধান সম্ভব এ বিশ্বাস তাঁর আছে ব'লেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি জেনেও সাহায্যের জন্তে তিনি মস্কোতে ছুটে যাওয়া দরকার বোধ করেননি ; ভারতের গণশক্তির উত্থানকল্পেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এর দ্বারা জাতির আত্মশক্তির প্রতি পণ্ডিত জওহরলালের যতখানি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আমরা তা পাইনি। তিনি ভারতের মুক্তিচিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বার্লিন ও টোকিওতে ফাসিস্ত শক্তির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। এক জরাজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির জন্তে তিনি আর এক নতুন উগ্র সাম্রাজ্য-বাদকে আহ্বান করেন। সুভাষচন্দ্রের মতো একজন বিশিষ্ট জাতীয় নেতার এই দূরদৃষ্টিহীনতা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। তবে জগতের বাস্তব কারো অপেক্ষা করে না, সে দুর্বার গতিতে আপন পথে চলে। যাদের মন সচেতন তারা সেই বাস্তবের সঙ্গে নিজের জীবনের ধারা ও কর্মপন্থাকে মিলিয়ে নেয়। ব্যষ্টির জীবনের ন্যায় সমষ্টির জীবনেও এটাই সত্য। কাজেই ইতিমধ্যে বাস্তবের যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় জীবনের

মোহ অনেকটা কেটে গেছে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও পথ নির্ণয় করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে যে একটা মহাবিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের মোহে অভিভূত হয়ে বৃটিশ শাসকগণ তা উপেক্ষা করেন এবং সেজন্যেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে রক্ষণশীলতার আশ্রয় নিয়ে একদিকে তাঁরা যেমন সব মারাত্মক ভুল করেন, অপরদিকে ভারতবাসীদের মধ্যেও অনেকে এ যুদ্ধের যথার্থ বৈপ্লবিক গতি অনুধাবন করতে না পেরে ভ্রান্ত পথের আশ্রয় নেন এবং তার ফলে গণস্বার্থের ক্ষতি হয়। এযুদ্ধ বাধবার বহুদিন আগে থেকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ভাষায় ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধ বাধবার পরও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফাসিস্ত শক্তির পররাজ্য-আক্রমণলিপ্সার নিন্দা করা হয়। এমন কি কংগ্রেসের তরফ থেকে বৃটেন এবং তার মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি নৈতিক সমর্থনও জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করা সম্পর্কে বলা হয় যে, আগে বৃটেনের সমরোদ্দেশ্য ও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অভিমত জানা একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে ঘোষণা করেন তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। নাবালক ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে ক্রমশ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দিকে নিয়ে যাবার যে মামুলি আশ্বাসবাণী বহুদিন থেকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুনিয়ে আসছেন, যুদ্ধ বাধবার পরও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বড়লাট লিনলিথগোর প্রথম ঘোষণাবাণীতে তার প্রতিধ্বনি ছাড়া বেশী কিছুই পাওয়া গেল না। কংগ্রেস, কেবল কংগ্রেস কেন, দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিমাত্রই তাতে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ল। অবস্থা দেখে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করায় বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরগণ প্রথমে খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সব প্রাদেশিক

মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের চেষ্টা করলেন; কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদেশগুলোর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক ব্যাপারে যেটুকু শাসনক্ষমতা ভারতবাসীদের হাতে এসেছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের পদত্যাগের ফলে আটটি প্রদেশে তাও সংকুচিত হয়ে গেল এবং শাসনকার্যের সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আমলাতন্ত্র একাধিপত্য পেয়ে নিরঙ্কুশভাবে জনমতের কণ্ঠরোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হ'ল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী নির্ভীকভাবে তার প্রতিবাদ জানালেন। তার ফলে আরম্ভ হ'ল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে যে আন্দোলনের সুরু, সেই আন্দোলন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অবস্থায় থেমে গেল; দেশের বৃহত্তর গণজীবনে তা কোন সাড়া আনতে পারল না। কিন্তু এর ফল ফললো এই যে, আমলাতন্ত্রের চাপে প'ড়ে দেশবাসী যেরূপ দ্রুতগতিতে মনোবল হারিয়ে ফেলছিল, গান্ধী-আন্দোলনের ফলে তাদের মধ্যে তা আবার খানিকটা ফিরে এল। আমলাতন্ত্র ভারতবাসীদের স্বাধীনতার দাবীকে চাপা দিতে পারল না; সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার বাণী বিশ্ববাসীকে শোনালেন।

এরপর আন্তর্জাতিক অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হয়; ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করে এবং কিছুদিন বাদে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বৃটিশ ও মার্কিন শক্তির বিরূদ্ধে জাপান সামরিক অভিযান চালায়। সোভিয়েট শক্তি আক্রান্ত হবার পরেই ভারতের কম্যুনিস্টগণ এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁরা কেবল এ যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি; ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে এটাকে বিশ্বের জনগণের যুদ্ধ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাঁরা সক্রিয়ভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করতেও

অগ্রসর হন। কংগ্রেস কিন্তু তার পূর্ব সঙ্কল্পেই অটুট থাকে। সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ায় কংগ্রেস তার প্রতি সহানুভূতি জানায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে যে, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে মিত্রপক্ষকে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে না। এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগদানের প্রশ্ন নিয়েই কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে মতদ্বৈধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি উভয়েই ফাসিস্তবিরোধী, কিন্তু ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ। কংগ্রেস ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়, কম্যুনিস্ট পার্টিও সেই দাবী সমর্থন করে; কিন্তু কংগ্রেস যেমন বলে যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীরা যুদ্ধের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, কম্যুনিস্টরা তা সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন যে, এ যুদ্ধে ভারতবাসীদের নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবার উপায় নেই, ঘটনাচক্রের আবর্তন সবাইকে যুদ্ধের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে এবং ভারতের বিপদও যে-কোন সময়ই আসতে পারে; সুতরাং যুদ্ধব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা আত্মঘাতী নীতিরই সামিল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই ভারতের কম্যুনিস্টগণ বিনাসর্তে মিত্রপক্ষকে সমরপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতে প্রস্তুত হন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ফাসিস্ত অভিযান আরম্ভ হবার পরই ভারতের কম্যুনিস্টগণ এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করায় তা নিয়ে এদেশের অনেকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন এবং তাঁরা ব'লে বেড়ান যে, ভারতের কম্যুনিস্টরা মস্কোর চর ছাড়া আর কিছুই নয়; তা না হ'লে য়ুরোপে সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ামাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে গেল কি ক'রে? তাঁরা আরো যুক্তি দেখান যে, জনযুদ্ধের নাম ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করা হচ্ছে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ এবং বৃটিশ শাসনাধীন আছে ব'লেই আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি বিচারসহ ব'লে মনে হয়। ভৌগোলিক বিচারে সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রান্ত

হ'লেই ভারতবর্ষের আতঙ্কিত হবার অবশ্য কোন কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট শক্তির প্রাণকেন্দ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হ'লে ভারতের কম্যুনিস্টদের বিচলিত হবার যথেষ্টই কারণ আছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পতন ঘটলে ফাসিস্ত শক্তি য়ুরোপে তথা সমগ্র জগতে যে কিরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াত সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই সোভিয়েট শক্তির বিপদে তার প্রতি ভারতীয় কম্যুনিস্টগণের সহানুভূতিজ্ঞাপন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। একমাত্র প্রশ্ন উঠতে পারে, সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হবার পর ভারতের কম্যুনিস্টগণ এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ব'লে ঘোষণা ক'রে মিত্রপক্ষের সমরপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে হ'লে বলতে হয়, সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রান্ত হবার পর জগতে সর্বসাধারণের সমক্ষে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কেবল কায়েম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই ফাসিস্তবাদের বিরোধ নয়, জগতের গণশক্তিরও সে শত্রু; তা না হ'লে ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রমণ করবে কেন? হিটলার ও মুসোলিনি কেবল কায়েম সাম্রাজ্যবাদীদেরই ধ্বংস করতে চান এ বিশ্বাস যাঁদের ছিল, সোভিয়েট ভূমিতে ফাসিস্ত বাহিনীর আক্রমণের কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা একটু বিব্রত হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটায় গোঁজামিল দেবার আশায় প্রকারান্তরে তাঁরা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ওপরই দোষ চাপাবার চেষ্টা করেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, মস্কোতে বৃটিশ দূত সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্ররোচনায় প'ড়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এমন সব কাজ করেন যার ফলে হিটলার চটে গিয়ে সোভিয়েট শক্তিকে আক্রমণ করেন। এটাকে যুক্তি না ব'লে ছেলেমানুষি বলাই ভাল। হিটলার কেন যে সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করেন, আগের অধ্যায়গুলোতে তা বিশদভাবে আলোচনা করেছি; কাজেই এখানে তার পুনরাবৃত্তি ক'রে লাভ নেই। কেবল এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ফাসিস্ত শক্তি যে গণশক্তির প্রত্যক্ষ

বিরোধী, হিটলারের বাহিনী কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হবার ফলে এই সত্যটা জগদ্বাসীর সমক্ষে স্পষ্ট দিবালোকের মতো সহজেই প্রতিভাত হয়। কাজেই ফাসিস্ত শক্তির আক্রমণে যখন জগতের শ্রেষ্ঠ গণশক্তি বিপন্ন, তখন ভারতের কম্যুনিস্টগণ গণস্বার্থের খাতিরে ভারতীয় জনসাধারণকে ফাসিস্তবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্তে আহ্বান না ক'রে পারেন না। ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য যদি যথার্থ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র হয়, তবে সোভিয়েট শক্তি আক্রান্ত হবার পর ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে যোগদান করতে ভারতবাসীদের আহ্বান ক'রে কম্যুনিস্টগণ যে খুব বড় একটা ভুল করেছেন এমন কথা বলা চলে না। ভুল কম্যুনিস্টগণ করেননি, ভুল করেছে বৃটিশ আমলাতন্ত্র। ভারতের জাতীয় দাবী স্বীকার ক'রে বৃটিশ আমলাতন্ত্র যদি উদার মনোভাব নিয়ে ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে শাসনক্ষমতা ও দেশরক্ষার ভার ছেড়ে দিত তবে এত অনর্থ ঘটত না; সেইক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির ন্যায় ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসও ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে অকাতরে সাহায্য করতে অগ্রসর হ'ত। কংগ্রেসের পুণা প্রস্তাবে সেকথা স্পষ্টভাবেই• বলা হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে বৃটিশ আমলাতন্ত্র এই বাস্তবকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার ক'রলো এবং তার ফলে কংগ্রেসের মতো একটা বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা থেকে মিত্রপক্ষ বঞ্চিত হ'ল। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের এই মূঢ় আচরণে ভারতের কম্যুনিস্টগণ যথেষ্টই দুঃখিত হন; কিন্তু তাঁরা এই আশায় বুক বেঁধে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন যে, বাস্তবের চাপে প'ড়ে বৃটিশ ও মার্কিন শক্তি যেমন সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে, বৃটিশ আমলাতন্ত্রও একদিন ভারতের জাতীয় দাবী মেনে নিতে তেমনই বাধ্য হবে। জাতীয় দাবীর পশ্চাতে যাতে গণশক্তির চাপ বৃদ্ধি পায় তদুদ্দেশ্তে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যবিধানের

চেষ্টা করে; কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে মিলনসাধনের চেষ্টাও সেই কর্মসূচীরই অন্তর্গত। কম্যুনিস্ট পার্টি বাস্তববোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে-পথে অগ্রসর হয়, পূর্ব এসিয়ার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের শোচনীয় অবস্থার ফলে সেই পথে খানিকটা সাফল্যের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। বিলাত থেকে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ভারতে প্রেরিত হলেন; একটা আশ্বাসবাণীও দেওয়া হ'ল, ভারতের জাতীয় দাবী যাতে পূরণ হতে পারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব নিয়েই সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতে এসেছেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবে কংগ্রেস তো দূরের কথা, মডারেট নেতাগণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল, আমলাতন্ত্রের স্তম্ভ লর্ড লিনলিথগো এবং সামরিক প্রভু ফিল্ড মার্শাল (বর্তমানে লর্ড ও ভারতের বড়লাট) ওয়াভেলের সাম্রাজ্যবাদী জারক রসে সমাজতন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড নিজ সত্তা হারিয়ে ফেলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা প্রহসনে পরিণত হ'ল। ভারতের ভাগ্য নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলায় সমগ্র জাতির প্রাণে নৈরাশ্য, ক্ষোভ, বেদনা ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, অথচ ভারতের পূর্ব প্রান্তে তখন প্রবল পরাক্রান্ত ফাসিস্ত জাপান উপস্থিত।

স্ট্যাফোর্ড-মিশন ব্যর্থ হওয়ায় আর একবার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ভারতীয়দের হাতে শাসনভার তুলে দিতে নারাজ, সাম্রাজ্যবাদকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতেই তাঁরা চান। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই বাস্তববিরোধিতা এবং রক্ষণশীলতাই কংগ্রেসের "আগস্ট প্রস্তাব"কে ডেকে আনে। কংগ্রেস বারংবার ভারতের স্বাধিকার চেয়ে ফাসিস্তবিরোধী সংগ্রামে সহযোগিতার সংকল্প জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও চার্চিল-গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সাম্রাজ্যবাদীসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেন তাতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নরমপন্থীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মহাত্মা গান্ধী তখন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে প্রস্তাব আনেন যে, ভারতবর্ষে

বৃটিশ শাসনের অবসান হোক অর্থাৎ শাসনকার্য চালাবার জন্যে বৃটিশ শাসকদের এখানে বসে থাকবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ভারতে "অহিংস আন্দোলন" চালাবার সংকল্পও তাতে থাকে। মহাত্মাজীর এই প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের নকল পাঠিয়ে বড়লাটকে মহাত্মাজী জানান যে, এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মতামত জানতে চান। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নেতা মহাত্মাজীর এই সাক্ষাতের অনুরোধটুকু পর্যন্ত বড়লাট রক্ষা করা দরকার বোধ করলেন না। তাঁর নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণসমেত মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হলেন। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো। দূরদৃষ্টিহীন একদল লোক স্বদেশোদ্ধারের উত্তেজনায় দেশের গণশক্তিকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পেলেন। কংগ্রেসের নির্দেশ ব'লে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসূচী প্রচার করলেন এবং তার ফলে লোকে উত্তেজনাবশে ডাকঘর, রেল-স্টেসন, থানা, সরকারী বাংলো, ট্রামগাড়ী ইত্যাদি পোড়াতে লাগলো এবং অনেক স্থানে রেল লাইন তুলে ফেললো। আমলাতন্ত্রও সুযোগ পেয়ে দাঙ্গাকারীদের সায়েস্তা করবার নামে সমগ্র দেশে নিরঙ্কুশভাবে দমননীতি চালালো। কংগ্রেসের নাম ক'রে যাঁরা এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের হয়তো মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপে সোভিয়েট শক্তিকে পরাজিত ক'রে ফাসিস্ত বাহিনী ক্রমশ ভারতের দিকে এগিয়ে আসবে এবং য়ুরোপীয় অবস্থার চাপে প'ড়ে বৃটিশ শাসকগণ ভারতবর্ষ থেকে তল্পিতল্পা গুটাতে বাধ্য হবেন; এছাড়া পূর্বদিক থেকে জাপানীরাও ভারতকে স্বাধীন ক'রে দেবার জন্যে নিশ্চয়ই অভিযান করবে। এ বিশ্বাস না থাকলে ডাকঘর, থানা ইত্যাদি পুড়িয়ে এবং কয়েকটা রেলপথ তুলে ফেলেই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত থেকে উৎখাত করা যাবে না—কেবল সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই বৃটিশ শক্তিকে যে ভারতছাড়া করা সম্ভব নয়—এধারণা অন্তত তাঁদের ছিল ব'লেই ধরে নেওয়া চলে।

যে-আশার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, বাস্তবের নির্মম আঘাতে তাঁদের সে আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল—স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মানদের ভাগ্যবিপর্যয় সুরু হ'ল এবং জাপানীরাও ভারতে প্রবেশ না ক'রে ব্রহ্মের সীমান্তেই রয়ে গেল। আমলাতন্ত্র আন্দোলন দমনে সক্ষম হ'ল; সন্ত্রাসবাদের টুঁটি চেপে ধরতে তার বিশেষ কষ্ট হ'ল না। আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে প'ড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক না কেন, ভারতের সন্ত্রাসবাদ দমনের শক্তি সে আজও হারায়নি। মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে যে সন্ত্রাসবাদ সীমাবদ্ধ সেই সন্ত্রাসবাদকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় করে না। তাই কমন্সসভায় সদস্যদের অভয় দিয়ে মিঃ চার্চিল বলেছিলেন—ভয় নেই, ভারতবর্ষ বৃটেনের হাতছাড়া হবে না; ভারতবর্ষে এবার যত গোরা সৈন্য পাঠানো হয়েছে এত গোরা সৈন্য আর কোনদিনই সেখানে পাঠানো হয়নি।

সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো বৃটিশ সামরিক বল যে ভারতবর্ষে আছে একথা অস্বীকার করবে কে? কিন্তু ভারতের যথার্থ গণশক্তিকে দমন করবার মতো সামরিক বল কি বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আছে? লর্ড উইলিংডন মহাত্মাজীর আইন অমান্য আন্দোলন দমন ক'রে একদিন ভেবেছিলেন, কংগ্রেসের প্রভাবকে তিনি খর্ব ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকালে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচনে কংগ্রেসই শীর্ষ স্থান লাভ করলো। এবারও কংগ্রেসকে দমন করা হয়েছে ব'লে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আচরণে যে দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে, যুদ্ধাবসানে কি তার আগেই হয়তো দেখা যাবে, কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ভারতের গণশক্তি আত্মপ্রকাশ ক'রে আবার বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়েছে। ভারতে এই গণশক্তিকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় করে, সন্ত্রাসবাদকে নয়। সেই জন্যেই কংগ্রেস সম্বন্ধে তাদের আশঙ্কা, মহাত্মাজী সম্বন্ধে এত ভয়। মহাত্মাজী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের দায়িত্ব বারংবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও

বৃটিশ আমলাতন্ত্র আন্দোলনের সকল দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে চলেছে। তার প্রতিবাদে তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনে মহাত্মাজীর জীবন যখন বিপন্ন, আমলাতন্ত্র তখনও পর্যন্ত জেদের বশবর্তী হয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে পারেনি। জননায়কদের কারারুদ্ধ ক'রে আমলাতন্ত্র যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিল, তার ফলে দেশে অনাচার ও স্বৈরাচার উদ্দাম বেগে ছড়িয়ে পড়লো। মজুতদার ও মুনাফাখোরদের লোভ অসংযত হয়ে উঠল, মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরা ক্রমশ স্ফীতোদর হতে লাগলো। সমাজজীবনের একাংশে এই আর্থিক স্ফীতির ফলে অপরাংশ কঙ্কালসার হয়ে পড়লো। সমগ্র ভারতের ওপর এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল; তা রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ ক'রলো বাংলার বুকে। বর্তমান মহাযুদ্ধে বাংলার দুর্ভিক্ষ বৃটিশ আমলাতন্ত্রের এক অক্ষয় কীর্তি।

দেশের জননায়কগণ কারাগারে, দুর্ভিক্ষে চারদিকে হাহাকার, অর্থনৈতিক সংকটে সমাজজীবনে বিপর্যয়, সমস্যার আশু প্রতিকারে আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য—চারদিকের এই সংকটের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি কর্মপথে এগিয়ে চলেছে। জাতির এই ঘোর দুর্দিনে তাদের ওপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে; কিন্তু তাদের পথে অন্তরায় বিস্তর; নীচেকার দিকে দু'চারজন লীগপন্থী তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও মুসলীম লীগের হাই-কমাণ্ড অদ্যাবধি কম্যুনিস্ট পার্টির আহ্বানে নির্বিকার, হিন্দু মহাসভা খড়্গহস্ত। একমাত্র আশার কথা, ভারতের গণজীবনে কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং এই ক্রমবর্ধমান গণশক্তির চাপে প'ড়েই হয়তো একদিন জাতীয় ঐক্যের জন্যে দলগত সংকীর্ণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে বিভিন্ন দলের নেতারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে মিলিত হতে বাধ্য হবেন।

কেবল জাতীয় ঐক্য বিধানই নয়, যুদ্ধাবসানে বেকার সমস্যা দেখা দিলে এদেশের বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সুবিধাবাদীরা যাতে বেকার যুবকদের

নিয়ে দলগঠনের সুযোগ না পায় সেই দিকেও এখন থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির নজর দিতে হবে। গত মহাযুদ্ধের পর হিটলারের নাৎসীদল গঠনে জার্মানীর মধ্যবিত্ত বেকার যুবকগণই ছিল প্রধান সহায়। সেজন্যেই ভারতে কম্যুনিস্ট-গণকে এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, যুদ্ধের পরে যাতে নতুন করে বেকার-সমস্যা না আসতে পারে এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যাতে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ বেশী ক'রে প্রচারিত হয়। আরো একটি বিষয়ে কম্যুনিস্টদের অবহিত হওয়া দরকার। ভারতে আজ বহু মার্কিন সৈন্যের আমদানী হয়েছে এবং এই সুযোগে মার্কিন পুঁজিপতিরা এদেশে শিল্প-প্রসারের নামে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থ ঢালতেও অগ্রসর হয়েছেন। এই মূলধনের নিরাপত্তার জন্যেই ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে Foreign Concession অর্থাৎ বৈদেশিক স্বার্থরক্ষার বিশেষ অধিকার লাভের দাবী উপস্থিত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। সেইক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রজীবনে এক নতুন সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের অনিষ্টকর প্রভাবের কথা কম্যুনিস্ট পার্টির বিস্মৃত হ'লে চলবে না।

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও সমাজগঠন

বাংলার অন্নকষ্ট আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি; কিন্তু সে দুর্ভিক্ষও এতটা প্রকট হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তা'ছাড়া সেই দুর্ভিক্ষের মূলে ছিল অনাবৃষ্টি ও অজন্মা, কিন্তু বর্তমান দুর্ভিক্ষের মূলে তেমন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যায় না। অবশ্য মেদিনীপুরের বন্যায় খানিকটা ক্ষতি হয় একথা সত্য, তা ব'লে সেটাকে সমগ্র বাংলাব্যাপী বর্তমান অন্নাভাবের একটা বড় কারণ ব'লে ধ'রে নেওয়া

চলে না। বর্দ্ধমানে দামোদরের বন্যায়ও লোক যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু বাংলা দেশে অন্নকষ্ট দেখা দিয়েছে তার অনেক আগেই। এতদ্ব্যতীত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যখন হয়েছিল তখন জড়বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হয়নি। আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। অনাবৃষ্টির জন্যে আজ আর ইন্দ্রের পূজো না ক'রে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সেচের ব্যবস্থা দ্বারা লোক ফসল উৎপাদন করতে পারে। প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর না ক'রে তাকে বশে এনে কাজে লাগাবার জন্যেই বিজ্ঞানের উদ্ভব ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যুগে বাস ক'রেও আজ আমরা নিরুপায়ের মতো 'হা অন্ন, হা অন্ন' ক'রে কেঁদে বেড়াচ্ছি এবং অদৃষ্টের লিখন ব'লে খানিকটা নিজেদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা পাচ্ছি। পরাধীন জাত আমরা—অদৃষ্টবাদী হওয়াই আমাদের স্বাভাবিক এবং আমাদের মধ্যে এই অদৃষ্টবাদ যতদিন বজায় থাকে, সাম্রাজ্যবাদীদেরও ততদিনই সুবিধে ; কেননা তাতে আসল সমস্যাকে তারা এড়িয়ে চলবার সুযোগ পায়। অদৃষ্টবাদকে বিসর্জন দিয়ে এদেশবাসীরা যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন সমস্যা সমাধানের জন্যে সত্যিই উদগ্রীব হয়ে ওঠে—তবে সাম্রাজ্যবাদের বাহক আমলাতন্ত্র এদেশের জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে নিশ্চিন্তে শাসনকার্য চালাতে পারে না। এদেশে অদৃষ্টবাদ না থাকলে এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন করতে হয় এবং আমলাতন্ত্রের যারা স্তম্ভস্বরূপ তাদের কায়েমী স্বার্থ ধ'রে টান পড়ে। কাজেই অদৃষ্টবাদ যত বেশী প্রবল হয় ততই আমলাতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের বেশী সুবিধে ; অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়ে সমাজজীবনের দুষ্ট ক্ষতকে প্রলেপে ঢেকে রাখতে কোন কষ্ট হয় না ; অথচ ভেতরে আসল ক্ষত থেকেই যায়। সেই ক্ষতটা যখন বারংবার বিশ্রী রূপে আত্মপ্রকাশ করে একমাত্র তখনই আমাদের মধ্যে সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আমলা-তন্ত্র সাময়িক সরকারী সাহায্যের প্রলেপ দিয়ে তা ঢেকে দিলেই আমরা আবার সব কথা বিস্মৃত হয়ে যাই। সঙ্কটের সময় সরকারী সাহায্য নিষ্প্রয়োজন এক থা

বলছি না; কিন্তু সেই সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাওয়াই বড় কথা নয়; অনুরূপ সঙ্কট যাতে আর না ঘটতে পারে তারই চেষ্টা করা কর্তব্য। সেই চেষ্টা করতে হ'লে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। স্বার্থান্ধ আমলাতন্ত্রের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না; সুতরাং এদেশবাসীকে যদি বাঁচতে হয় তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অদৃষ্টবাদ ছেড়ে সকলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভের অর্থ এ নয় যে, দেশের সকলেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের এই নৈসর্গিক দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হওয়া যে সম্ভব, সর্বসাধারণের মধ্যে সেই বোধশক্তিকে জাগ্রত করাই হ'ল আসল কাজ। আর নিরন্নের সেবাব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা খুব বেশী আবশ্যক। নিরন্ন, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে একমুষ্টি অন্নদান ক'রে আশু বাঁচানো দরকার সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই দয়ার ওপরই যাতে তাদের দীর্ঘকাল নির্ভর ক'রে থাকতে না হয় তারই চেষ্টা করা উচিত। নিরন্নকে কেবল অন্ন দিলেই হবে না, তাকে দিতে হবে কাজ। কাজ দেবার সার্থকতা রয়েছে দু'কারণে। লোকের দয়াবৃত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং যত মর্মান্তিকই হোক না কেন, এক অবস্থা দেখে দেখে লোকের অনেকটা তা গা-সহা হয়ে যায় এবং ক্রমশ সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা বলে মনে হয়। দ্বিতীয় কারণ, আজ যারা নিরন্ন হয়ে মরতে চলেছে তাদের অধিকাংশই ভিক্ষাজীবী ছিল না। চাষবাস কিংবা অন্য যে-কোনো রকম কাজের দ্বারা তারা জীবিকার্জন করত। তার অর্থই হ'ল এই যে, যেদিক দিয়েই হোক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় তারা সাহায্য করত। সুতরাং সমাজের এই একটা বৃহৎ অংশ যদি কেবল পরের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে বেশিদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে তবে সমাজের মোট উৎপাদন বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তার ফলে অবস্থা উন্নতির দিকে না গিয়ে আরো বেশী খারাপের দিকে যাবে।

বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। নিরুপায় হয়ে পাড়াগাঁ থেকে কোলকাতা

সহরে এসে যারা দু'মুঠো অন্নের জন্যে ঘুরে বেড়ায় তাদের অনেকেই কোলকাতার আশেপাশে গেরস্তালি ক'রে খেতো। তাদের অনেকের নিজেদের সামান্য জমিজমা ছিল, আবার অনেকে পরের জমি বর্গায় চাষ ক'রে জীবিকা-নির্বাহ করত। এছাড়া জমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যাও যথেষ্ট রয়েছে। তারা গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে আসায় তাদের জমিগুলো পতিত প'ড়ে থাকারই সম্ভাবনা। অভাবে প'ড়ে তাদের অনেকেই বাড়ীঘর, জমিজমা ও গরুবাছুর বেচে আসে। হয়তো গ্রামের বড় বড় জোতদারদের হাতে তাদের জমি গিয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্নাভাবে গ্রামগুলো যেভাবে উজাড় হয়ে যাচ্ছে তাতে ক'রে জোতদারদের পক্ষেও জমিচাষের জন্যে যথোপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কেবল কোলকাতার আশেপাশেই নয়, সমগ্র বাংলা দেশেই এই অবস্থা। এর ফলে এই দুর্ভিক্ষের আগে বাংলাদেশে যে-পরিমাণ জমিতে চাষ হ'ত, এই দুর্ভিক্ষের পরে হয়তো তার চেয়ে অনেক কম জমিতে চাষ হবে। তাতে পতিত জমির পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ফসল-উৎপাদন কমে আসবে।

কোনো দেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন সেখানে অন্নাভাবে যে কেবল লোকই মরে এমন নয়; গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যেও মড়ক দেখা দেয়। অতএব দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় অদূর ভবিষ্যতে জমিচাষের জন্যে কেবল যে লোকেরই অভাব হবে এমন নয়, হাল-গরুর জন্যেও খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। তার প্রতিকার হতে পারে একমাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা ক'রে। সোভিয়েট সমবায় প্রথায় বাংলাদেশে চাষের ব্যবস্থা করা গেলে বাঙালী জাতির খাদ্যাভাব না হবারই কথা; কারণ বাংলাদেশে এখনও এত পতিত জমি রয়েছে যেগুলোতে একটু চেষ্টা করলেই ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করলে উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে প্রধান অন্তরায়: (১) বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং

(২) চাষের আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। সোভিয়েট সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করতে হ'লে সর্বাগ্রে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ক'রে জমিগুলোকে ঐকত্রিক খামারে এনে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিতে হবে। কেবল জমি বণ্টন করলেই চলবে না, জমি চাষের জন্যে কৃষকদের ট্র্যাক্টর (কলের লাঙ্গল) এবং বীজধান সরবরাহ করতে হবে। তা নইলে শুধু ভাঙ্গা লাঙ্গল ও আধমরা হালের গরুর ওপর নির্ভর ক'রে এই বুভুক্ষিত বাঙালী জাতির মুখের অন্ন যোগানো সম্ভব হবে না। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে চাষের জমি বাঁচাবার জন্যেও আধুনিক জড়বিজ্ঞানেরই আশ্রয় নিতে হবে। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে দামোদরের বন্যা রোধ করাও যেমন সম্ভব, অনাবৃষ্টির সময় ইন্দ্রের পূজো না ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করাও তেমনই সম্ভব। এগুলো রূপকথার অলীক কাহিনী নয়—বাস্তব জগতে যে এগুলো সম্ভব, এদেশের লোকের মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি এনে দেওয়াই আজ সবচেয়ে বেশী দরকার। দেশের জমিগুলোকে ঐকত্রিক খামারে পরিণত ক'রে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা, বীজধান সরবরাহের জন্যে গোলা স্থাপন, জমি চাষের জন্যে ট্র্যাক্টর সরবরাহ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ছোট ছোট কৃষি-গবেষণাগার স্থাপন, খাল কেটে ও নলকূপ বসিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা, বাঁধ দিয়ে নদীর বন্যা রোধ করা প্রভৃতি কাজগুলো সরকারী চেষ্টায়ই হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এসব ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন। কাজের কথা বললেই তাঁরা অর্থাভাবের দোহাই পেড়ে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন। ফলে সমস্যা সমস্যায়ই থেকে যায়। জনসাধারণের সমর্থিত যথার্থ শক্তিশালী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এর স্থায়ী প্রতিকার হওয়া একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু আমলাতন্ত্র উদাসীন ব'লেই একেবারে হাত-পা ছেড়ে নিরাশ হয়ে আমাদের বসে থাকলে দুর্গতি ক্রমশ বেড়েই চলবে। বেসরকারী চেষ্টায় ব্যাপকভাবে না হ'লেও খণ্ড খণ্ড

ভাবে এরূপ আদর্শ খামারের প্রবর্তন ক'রে লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের এই দুর্গতির মোচন হওয়া সম্ভব। তাই আজ যাঁরা দুর্গতের সেবাকার্যে অগ্রসর হয়েছেন, নিরন্নদের জন্যে কেবল সাময়িকভাবে দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা ক'রেই তাঁরা ক্ষান্ত না হয়ে যদি দেশের লোকের প্রাণে বাঁচবার ক্ষীণ আশাও জাগিয়ে তুলতে পারেন তবেই তাঁদের সেবাকার্য যথার্থ সার্থক হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকের অভাব নেই, চেষ্টা করলে এই যুদ্ধের সময়ও কিছু কিছু চাষের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা না যায় এমন নয়, দেশে ধনীও আছেন, কর্মীর অভাবও বাংলাদেশে হবার কথা নয়। এ সমস্তের সমবায়ে বাংলাদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা সরকারী চেষ্টা ছাড়াও খানিকটা অগ্রসর হতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করতে গেলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিরও দরকার। সুতরাং সেই সব যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রয়াস পেলে যন্ত্রশিল্পও অগ্রসর হবে এবং আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করতে গিয়ে তার সঙ্গে চাষীদের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে। তার ফলে চাষীমন বিজ্ঞানবিমুখতা ছেড়ে ক্রমশ যন্ত্রশিল্পের দিকে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দেশের মধ্যে যত বেশী প্রসারিত হবে ততই দেশবাসী নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। দেশের লোকের মধ্যে তখন এই বোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেবে যে, গণ-সমর্থিত শক্তিশালী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ছাড়া প্রকৃত পক্ষে জাতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। জাতীয় দাবীকে শক্তিশালী ক'রে তোলবার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

অতএব আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে যাঁরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়েছেন তাঁদের প্রধান কাজ হ'ল অদৃষ্টবাদকে লোপ ক'রে দেশবাসীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেওয়া। দেশসেবা করতে গিয়ে কেবল ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হ'লে তা বুদ্বুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী হয়, তদ্দ্বারা কোন স্থায়ী ফললাভের আশা থাকে না। অবশ্য আদর্শের প্রেরণা না থাকলে কেউ কোনো বড় কাজ করতে পারে

না; কিন্তু আদর্শের প্রেরণা ও ভাবাবেগ যে এক বস্তু নয় সেকথা বিচার করবার দিন আজ উপস্থিত। ভাবাবেগের পশ্চাতে কোনো বিচারবুদ্ধি থাকে না, থাকে একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস। মানুষের মধ্যে যে সৎপ্রবৃত্তি থাকে অবস্থাবিশেষে সেটা সময় সময় জাগ্রত হয়ে ওঠে সত্য; কিন্তু মনের সচেতনতা অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে সেটা ভাবালুতায়ই পর্যবসিত হয়। কিন্তু আদর্শের প্রেরণার পশ্চাতে থাকে একটা বিচারবুদ্ধি। কার্য-কারণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে সমস্যার মূল নির্ণয় ও তার প্রতিকারের চেষ্টা করাই হ'ল যথার্থ আদর্শের প্রেরণা। কাজেই আদর্শবাদী ও ভাববিলাসীর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ইংরেজীতে Idealist বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে একটা Utopiaর ভাব আছে; অর্থাৎ তাকে কল্পনাবিলাসীও বলা চলে। কিন্তু আমরা আদর্শবাদ বলতে ঠিক তা বুঝব না। আমাদের আদর্শবাদ হবে বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত। বস্তুজগৎ ছেড়ে যারা কেবল কল্পনাজগতে ঘুরে বেড়ায়, আদর্শবাদী তারা নয়—তারা ভাববিলাসী। লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই যথার্থ আদর্শ। লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে পথের সন্ধান জানা চাই এবং যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যত বেশী প্রখর, লক্ষ্যের দিকে সে তত দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারে। বাস্তববোধ না থাকলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না; কাজেই আদর্শ অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে বাস্তববোধ তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে চলে না। সুতরাং আমাদের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর।

শেষ

এই বইএ সংকলিত প্রবন্ধগুলোর জন্যে আমি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, অরণি, স্বদেশ, ভৈরব, জনসেবা, অভিযান প্রভৃতি পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণের নিকট ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থকার